

৯৬৯

কাহিনি: ত্রিজিৎ কর

প্রথম অধ্যায়

॥ বিষাদ যোগ ॥

ঘুমের ওষুধগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিল সব্যসাচী। ছোট্ট ঘুপচি ঘরটার দেওয়াল জুড়ে লাগানো ক্রিকেটারদের ছবি, খবরের কাগজ কিংবা ম্যাগাজিন থেকে কাটা বিজ্ঞানীদের ছবি সব যেন আজকে ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। সবাই যেন ফিসফিস করে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করছে সব্যসাচীর সমস্ত ব্যর্থতা নিয়েই!

"তুমি একটা লুজার সব্য। তোমার কিছু হয়নি। আর কোনোদিন কিছু হবেও না। ইউ আর আ ড্যাম ফেইলিওর!"

রিনার বলা কথাগুলো কানের সামনে কে বা কারা যেন লাউডস্পিকারের মতন চালিয়ে দিচ্ছে। ওর কান মাথা ধরে যাচ্ছে। বারংবার এই শব্দগুলো যেন কামড় বসাচ্ছে ওর সারা শরীরে।

ফেইলিওর! ব্যর্থ! সত্যি তো তাই। রিনা কি ভুল বলছে কিছু? আয়নার দিকে একবার তাকাল সব্যসাচী। দীর্ঘ দিনের অযত্নে আয়নার উপরে যে পুরু ধুলার আস্তরণ পড়েছে তা ভেদ করে নিজের মুখখানা আর ভালো করে দেখা যায় না। তবুও কি মনে হতে সব্যসাচী হন্তদন্ত হয়ে উঠে গিয়ে পাগলের মত আয়নাটা দুই হাত দিয়ে ঘষতে লাগল।

একসময় আয়নার উপরের ধুলোর স্তর উঠে গিয়ে আয়নার ভিতর থেকে উঁকি মারতে লাগল এক অলীক স্মৃতি জগৎ। সব্যসাচী কি ঠিক দেখছে? ওই তো আয়নার ওপারে দাড়িয়ে আছে বছর পাঁচেকের ছোট্ট সব্য। মাথার চুল সুনিপুণ ভাবে আঁচড়িয়ে দিয়েছে মা। স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিন।

সব্যসাচী ঘোষাল। ক্লাস ওয়ান। সেকশন বি। রোল নম্বর আঠেরো। মায়ের দু চোখে জ্বলজ্বলে স্বপ্ন। সব্যসাচীর মনে পড়ছে ওর বাবা সেই সময় থেকেই এক প্রকার বেকার। স্থির কাজ বলে কোনোদিনই তো বাবার কিছু ছিল না। যখন যে কাজ পাওয়া যেত তখন সেই কাজ। কখনও বাজারে সবজি নিয়ে বসছে কখনও

কোনো আপিসের সুইপার। প্রতি মাসেই এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সব্যসাচী চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনত বাবার নতুন নতুন কাজের ফিরিস্তি।

তবুও হাজারও কাজ বদলেও কোনো লাভ হয়নি। যত দিন গেছে অর্থাভাব কেবল বেড়েছেই। মায়ের শরীর রুগ্ন হয়েছে। বাবার মুখ আগের থেকেও হতশ্রী। এই তো সেদিনের ঘটনা। আয়নার ভিতরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সেই দৃশ্য।

সব্যসাচী ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। ঘরের দরজা বন্ধ। মা, বাবা কারুরই তো এ সময় থাকার কথা নয়। তাহলে ঘর ভেতর থেকে বন্ধ কেন? ঘরের দরজা একবার, দুবার, তিনবার ধাক্কা দিল সব্যসাচী। কোনো লাভ হল না। অগত্যা উপায় না দেখে ডাকাডাকি, হাঁকা হাঁকি। পাশের বাড়ির লোকেরাও ছুটে এল।

এত ডাকাডাকির পরেও সাড়া শব্দ নেই দেখে সকলের মুখেই কেমন যেন আষাঢ়ের মেঘ। দরজা ভাঙা হল তৎক্ষণাৎ। ক্লাস সেভেনের সব্যসাচী দেখল খাটের থেকে তিন হাত উপরে ভেসে আছে দুটো কঙ্কালসার পা। পা দুটো ও বিলক্ষণ চেনে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। নিজের হাতেই তো বাবার পায়ে এই ব্যান্ডেজ বেধে দিয়েছিল ও।

সব্যসাচীর দুর্ভাগ্য সেই বোধহয় শুরু। পড়াশুনায় কোনোদিনই খুব ভালো বা খুব খারাপ কোনোটাই ছিল না সে। তবে স্কুলে প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে সবসময় থাকত সব্যসাচী ঘোষালের নাম। ওই তো আয়নায় ভেসে উঠছে সেদিনকার ছবি। ক্লাস নাইন। স্কুলে তৃতীয় হয়েছে সে। মাকে বলায় মায়ের মলিন মুখে সেই কী সুন্দর হাসি। মা রাতে পায়েস রাঁধল। কী সুন্দর হয়েছিল সেই পায়েসের স্বাদ। আজও যেন মুখে লেগে আছে...

কোথায় গেল মা? কোথায় গেল মা! আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই সারা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সব্যসাচীর। আয়নার মধ্যেই ফুটে উঠছে ছবি। এই ঘরেই বিছানার উপর শুয়ে আছে মা। রুগ্ন শরীর। মুখে ক্লান্তি। শুকিয়ে যাওয়া বুকের পাঁজরগুলো উপর নিচ করছে কেবল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

সব্যসাচীর তখন কলেজ শেষ। ছোটবেলা থেকে মনের ভেতরে পুষে রাখা ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন তো বহু আগেই জলাঞ্জলি হয়ে গেছিল। বন্ধুরাও এদিকে

ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে দুমদাম চাকরির খবর দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে দু’বছর অতিক্রান্ত। মাস্টার্স করা হল না অর্থের ওভাবে।

সব্যসাচী তখন ওষুধের দোকানে সারাদিন পাগলের মত খাটে। বাড়ি ফিরে সারারাত পাগলের মত প্রস্তুতি নেয় সরকারি চাকরির। সেইদিন ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল অনেক। ভেজা শরীরে ঘরে ঢুকতেই বুকের ভেতর কেমন যেন অস্বস্তি জমাট বেঁধে উঠল ওর। মা কোনো সাড়া দিচ্ছে না কেন। প্রতিদিন ঘরে পা দেওয়া মাত্রই ক্ষীণ স্বরে হলেও মা তো ডাকে, “খোকন এলি!”

সব্যসাচী ওষুধের প্যাকেট ফেলে ছুটে যায় মায়ের সামনে। মায়ের কঠিন অসুখ। চিকিৎসার টাকা হাজার চেষ্টাতেও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। রিনার থেকে কিছু টাকা বেশ কয়েকবার নিয়েছে বটে ও। কিন্তু যতই হোক। বারবার হাত পেতে টাকা নিতে বড় লজ্জা করে ওর।

“মা, মা! তুমি ঠিকাছো? কথা বলছ না কেন? মা...” সব্যসাচী মায়ের মাথায় হাত বোলাতে থাকে পাগলের মতন। মায়ের শীর্ণ বুকের ওঠানামা আরও ধীর হয়ে আসে। মায়ের কথা জড়িয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে সব্যসাচীর মুখে কেবল একবার হাত বোলায় মা। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কোনোমতে বলে, “বড় হও বাবা... অনেক বড় হও...”

তারপর কেবল নীরবতা। সেই রাতে মাকে আগলে ঐভাবে কত ঘন্টা যে সব্যসাচী ওভাবেই বসেছিল ও জানে না। বাইরে অবিরত বৃষ্টি। একসময় বৃষ্টি থেমে গিয়ে গাঢ় অন্ধকার। তারপর ভোরের আলো। যখন সম্বিৎ ফিরল সব্যসাচীর, মায়ের হা করা মুখের উপর দু’একটা মাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরপরেও দেখতে দেখতে কেটে গেছে আরও বছর তিন। কত পরীক্ষা। কত ইন্টারভিউ। কোনো লাভ হয়নি। শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। হিসেব করে দেখেছে সব্যসাচী। এখনও অব্দি মোট বত্রিশ খানা ইন্টারভিউ দিয়েছে ও জীবনে।

আয়নার ওপারে থাকা মানুষটাও যেন হাসছে সব্যসাচীর কাণ্ড কারখানা দেখে। ওর হাসি নীরবে জিজ্ঞেস করছে, “আর কত? আর কত অজুহাত দিবি? তোর ব্যর্থতার তুই ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়! কেউ না...”

রিনার বিয়ে হয়ে গেল তাও মাস তিনেক। ওর তো দোষ নেই। ও চেষ্টা করেছিল তো। আর কতদিনই বা ও একজন ব্যর্থ মানুষের জন্য অপেক্ষা

করবে! আর কত? একসময় তো ভালোবাসাও ফুরিয়ে যায়। বিরক্তি আসে। ঘৃনা আসে। ব্যর্থতার তো কোনো প্রতিষেধক নেই। এই রোগের কোনো নিরাময়ও নেই!

বিছানার উপর এসে ধপ করে বসে পড়ে সব্যসাচী। পাশেই টেবিলের উপর খোলা রয়েছে সাদা কাগজে লেখা ওর শেষ চিঠি। কী ছাই পাশ লিখেছে ভগবান জানে। চোখের জলে পেনের কালি উঠে গিয়ে না থাকলে হয়তো কেউ কেউ ওই চিঠি মর্মদ্ধার করবে। করেই বা কী! ওতে শুধু হতাশা আর দীর্ঘ শ্বাস। এসব মানুষ শুনতে চায় না। জানতেও চায় না। এ দুনিয়া সাফল্যের জয়গান গায়।

আর সাফল্য তাদের কাছেই ধরা দেয় যাদের টাকা আছে। হ্যাঁ, আজ জীবনের এই চরম মুহুর্তে এসে সব্যসাচীর কেবল মনে হয় যদি ওর টাকা থাকত, যদি ও ছোটবেলায় ওর স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ পেত কিংবা বড় হয়ে বন্ধুদের মত বেসরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেত কিংবা কিংবা কিংবা.... যে যাই বলুক টাকা থাকলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। অনেক অনেক সহজ।

“হে ঈশ্বর, পরের জন্মে যেন আর এই দারিদ্রের মধ্যে জন্ম নিতে না হয়! যেন আর এই ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে না হয়। পরের জন্মে যেন আমি ধনী হই। অশেষ সম্পদের মালিক হই। সোনার চামচ মুখে নিয়েই যেন জন্ম হয় আমার!”

আয়নার দিকে তাকিয়েই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে ওঠে সব্যসাচী। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে ধরা ঘুমের ওষুধের কৌটা। বহু কষ্টে ওষুধের দোকান থেকে সরিয়েছে এটা। এই ওষুধগুলো খেলেই মুক্তি। এই জীবন সংগ্রাম থেকে মুক্তি। এই জীবনে, এই লড়াই আর লড়তে পারছে না ও! ওর মুক্তি চাই। এই জীবনের অসহ্য ভার থেকে চিরমুক্তি চাই ওর।

ঘুমের ওষুধগুলো মুঠো ভরে নিয়ে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয় সব্যসাচী। তারপর ঠিক কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে চারিদিক কেমন ঝিম ধরে আসছে। ওই তো বাবা ডাকছে, ওই যে ভেসে মায়ের গলার স্বর... চারিদিক ঝাপসা হয়ে ধীরে ধীরে কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে।

অন্ধকার, অন্ধকার এমন ভয়ঙ্কর গাঢ় অন্ধকার যা মৃত্যুর মত শীতল। এই কি তবে মৃত্যু!

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ সাংখ্য যোগ ॥

সারা শরীরটা একবার যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সব্যসাচীর। আস্তে আস্তে চোখ খুলতেই চমকে উঠল ও। এ কোথায় এসে পৌঁছেছে ও? এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় বসে আছে ও!

অবিশ্বাসের চোখে একবার এদিক ওদিক ভালো করে চেয়ে দেখল সব্যসাচী। একটু আগেই তো ও নিজের বিছানায় ছিল। বিছানার পাশের টেবিলে ছিল শেষ লেখা চিঠি। হাতে ছিল ঘুমের ওষুধের কৌটো। আয়নায় ছিল হেরে যাওয়া মানুষের নগ্ন প্রতিচ্ছবি। আর দু'চোখে ছিল অপার ঘুম। তাহলে! এইখানে ও এসে উপস্থিত হল কী করে?

নিজের দিকেই একবার ভালো করে চেয়ে দেখল একবার সব্যসাচী। ও এই মুহূর্তে একটা চেয়ারে বসে আছে। ওর হাত আর পা চেয়ারের সঙ্গে আবদ্ধ। তবে দড়ি বা শিকল দিয়ে নয়। এক প্রকার অত্যাধুনিক ধাতব বন্ধন দিয়ে। ওর পরনে সাদা পোশাক।

"বিপ বিপ বিপ..."

ক্রমাগত কানের সামনে কী একটা শব্দ ভেসে আসছে না? কিসের শব্দ এটা?

"নরকে আপনাদের স্বাগত!"

একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠে এইবার সব্যসাচী চমকে উঠল।

"জীবদ্দশায় করা পাপের জন্যই আপনাদের এখানে আনা হয়েছে। প্রতিটি জীবাত্মাকেই তার আগের জন্মের কৃত কর্মফল ভোগ করে তবে পরের জন্মে যেতে হয়। তাই নরক কেবলমাত্র কর্মফল ভোগ করার স্থানই নয়, পরের জন্মে যাওয়ার দরজাও..."

সব্যসাচী এইবার চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখল। ও বসে আছে একটা বিরাট মাঠের মধ্যে। সেই বিরাট মাঠের চার কোনায় বড় বড় চারখানা লাইট পোষ্টে আলো জ্বলছে। তাতে দেখা যাচ্ছে আয়তাকার সেই মাঠের ধার বরাবর থরেথরে সাজানো রয়েছে এমনই আরও অনেকগুলো চেয়ার।

সেই সমস্ত চেয়ারে বসে আছে আরও অসংখ্য পুরুষ ও নারী। প্রত্যেকের পরনেই সাদা পোশাক। প্রত্যেক হাত চেয়ারের সঙ্গে বাধা একরকম অত্যাধুনিক লোহার শিকল দিয়ে। আর প্রত্যেক গলায় একটা ঢাউস লাল রঙের কলারের মত কিছু বাধা। যেটায় একটা লাল আলো নিভছে আর জ্বলছে। সব্যসাচী এইবার খেয়াল করে দেখল হুবহু একই রকম কলার ওর গলাতেও বাধা আছে। সেখান থেকেই এতক্ষণ ধরে ভেসে আসছে বিপ বিপ শব্দটা।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়াং ভূত্বা ভবিতে বা ন ভুয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হণ্যতে হন্যমানে শরীরে

...আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই জীবাত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। কেবল পোশাকের মত একটির পর একটি শরীর সে গ্রহণ ও ত্যাগ করে। তাই কোনো জন্মের পরিচয়ই জীবাত্মার নিজস্ব পরিচয় নয়। সে কারণেই পরমাত্মা কর্তৃক আপনাদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই সংখ্যাই এখন আপনার পরিচয়...."

মাঠের ঠিক প্রান্তে লাগানো বিশাল স্ক্রিনের দিকে এইবার নজর যায় সব্যসাচীর। সেইখানেই সে এবার এই ধারাভাষ্যের বক্তাকে প্রথমবারের জন্য দেখতে পায়। বক্তার মুখে বিকট দর্শন দানবের মুখোশ। দেখে মনে হয় মুখোশটি তিব্বতী ধাঁচে তৈরি। সুনিপুণ কারুকার্যমন্ডিত মুখোশের মাথায় সাত খানা ছোট ছোট মনুষ্য কঙ্কালমুন্ড অলঙ্কারের মত শোভা পাচ্ছে। বক্তার পরনে গাঢ় নীল রঙের জোব্বা। হাতে একটি বিশাল দণ্ড।

কে ইনি? ঠিক কোথায় এখন বসে আছে সব্যসাচী? বিস্মিত চোখেই চারপাশের মানুষগুলোকে আরও একবার ভালো করে দেখে। কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী থেকে মধ্য বয়স্ক, বৃদ্ধ বিভিন্ন বয়সের মানুষ এইখানে উপস্থিত।

প্রত্যেকের চোখে মুখেই একইরকমের বিস্ময়। একই রকমের আতঙ্ক। একবারের জন্য স্ক্রিনের সেই ভয়ঙ্কর মুখোশধারীকে দেখে ভয় লাগে সব্যসাচীর। সত্যিই কি ও নরকে এসে পৌঁছেছে! এই কী নরক যার কথা ছোট থেকে শুনে এসেছে ও!

“পরমাত্মা কর্তৃক প্রদান করা প্রতিটি মনুষ্য জীবন অসীম গুরুত্বপূর্ণ।”

আবারও সেই ভারী পুরুষ কণ্ঠে গমগম করে ওঠে চারিদিক।

“সেই কারণেই আত্মহত্যা মহাপাপ। এখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই এই পাপের ভাগীদার। আপনারা প্রত্যেকেই এই ভয়ঙ্কর পাপ সাধনের ফলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুর তারিখ চৌঠা জানুয়ারি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই এখন সময় হয়েছে আপনাদের কর্ম ফল ভোগ করার। তবে চিন্তা করবেন না এই নরকেই আপনারা সুযোগ পাবেন আপনাদের পরের জন্ম নির্ধারণের!”

বক্তার কণ্ঠে এইবার যেন একটা অদ্ভুত রহস্য খেলা করে। হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে যায় সব্যসাচীর। মৃত্যুর ঠিক আগে ওর শেষ ইচ্ছা যেন কী ছিল! পরের জন্মে যেন আর দরিদ্র হয়ে জন্মাতে না হয়, পরের জন্মে যেন আর এত কষ্ট সহ্য করতে না হয়...পরের জন্মে ও যেন ধনী হয়, প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়, ওর যেন জন্মই হয় সোনার চামচ মুখে নিয়ে...

“ঠিকই শুনেছেন, আপনাদের হাতেই আছে আপনাদের পরের জন্মের চাবি কাঠি। আপনার কাছে সুযোগ আছে নিজেদের নিয়তি নির্ধারণের। তবে তার আগে, আপনাদের প্রত্যেককে পরমাত্মা কর্তৃক প্রদান করা সংখ্যাটি একবার দেখে নিন। আপনাদের ডান হাতের কব্জিতে সংখ্যাটি খোদাই করা আছে!”

সব্যসাচী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান হাতের কব্জির দিকে তাকায়। আর অবাক হয়ে দেখে সেখানে সত্যিই ট্যাটুর মতন খোদাই করা আছে একটি অদ্ভুত সংখ্যা...

“৯৬৯” (নয় ছয় নয়)

সব্যসাচীর পাশের চেয়ারেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে সব শুনছিলেন। তিনিই এইবার বলে উঠলেন, “এখানে কী হচ্ছেটা কী! এ কোথায় ধরে এনেছে আমাদের। আমি তো ছিলাম আমার বাড়িতে। আচমকা

এখানেই বা এলুম কী করে! আর এরা কারা? এরা যা বলছে তা মানতেই বা যাব কেন!”

মাঠের মধ্যে এবার সত্যিই জোর কলরব উঠল। সকলেই এর ওর সঙ্গে কথা বলছে। নিজের মনেই গর্জে উঠছে। কেউ কেউ তো জোর কণ্ঠে গালাগাল দিচ্ছে।

এর মধ্যেই একটা মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেল সব্যসাচী। ওর থেকে কয়েকটা চেয়ার পরেই নিজের চেয়ারে শান্ত হয়ে বসেছিল মেয়েটা। চুল ঘাড় অব্দি ছোট করে কাটা। মুখে একটা প্রশান্তির ভাব। যেন এক মনে কী একটা ভাবছে সে। সত্যিই এই স্ক্রিনের লোকটা যা বলছে যা তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এই মেয়েটাও আত্মহত্যা করেছে!

কিন্তু কেন? এমন মায়াভরা মুখ যার, তার জীবনে কত দুঃখ থাকলে সে নিজের জীবন নিজেই কেড়ে নিতে পারে?

দুম!

আচমকাই প্রচন্ড শব্দে সারা মাঠ যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক যেন সামনেই প্রচন্ড জোরে বোমা ফাটানো হয়েছে কোথাও। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই প্রচন্ড শব্দে কানে যেন তালা লেগে গেল সব্যসাচীর। শুধু সেই নয়, সমগ্র মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকেই যেন মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সেই প্রচন্ড শব্দে। নীরবতায় ডুবে গেছে গোটা মাঠ।

সেই নীরবতাকেই খান খান করে আবারও শোনা গেল সেই পুরুষ কণ্ঠ,

“জীবাত্মাদের অনুরোধ করা হচ্ছে শান্ত হতে। মৃত্যুর পর অধিকাংশ জীবাত্মাই নিজেদের প্রকৃত সত্বাকে বিশ্বাস করতে চান না। মনুষ্য জীবনের স্মৃতি ও মায়া তাদের সাময়িক ভাবে অন্ধ করে রাখে। এই স্বাভাবিক। এর আগেও আপনারা বহুবার জন্মেছেন। এবং মৃত্যু বরণ করেছেন। এর পরেও বহুবার জন্মাবান। এই নরকেও আপনাদের এই প্রথমবার আসা নয়। তাই শান্ত হোন। কারণ এরপর আমি যা বলতে চলেছি তা আপনাদের প্রত্যেকের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকেই এইবার একে ওপরের মুখের দিকে তাকায়। এক মধ্য বয়স্ক লোক। মাথায় চওড়া টাক। আচমকাই চিৎকার করে বলে ওঠে,

“আমরা সত্যিই নরকে আছি? আমরা কি সবাই মৃত? তাহলে এই শরীর কিসের? এসবের মানে কী?”

সারা মাঠ জুড়ে আবারও প্রচন্ড কোলাহল শোনা যায়। আবারও সবাইকে চুপ করানোর জন্য সেই প্রচন্ড শব্দ হয়।

দুম!

এইবার শব্দের তীব্রতা যেন আরও বেশি। সব্যসাচীর সারা শরীর যেন সেই বিকট বিধ্বংসী শব্দের তীব্রতায় প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ওঠে।

“জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নেই। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈণং দহতি পাবক...”

সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠের ছন্দবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণে চারিদিক যেন কম্পিত হতে থাকে।

“আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই জীবাত্মা অতি সূক্ষ শরীর ধারণ করে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনাগমন করে থেকে। তবে আপনারা সকলেই বর্তমানে মৃত। আপনারা যা এখন শরীর বলে ভাবছেন তা কেবল একটি ভ্রম মাত্র। যেহেতু কেবল মনুষ্য শরীরই দুঃখ, যন্ত্রনা, শোক তাপ অনুভব করতে পারে, তাই নরকে প্রত্যেক জীবাত্মাকেই কর্ম ফল ভোগের সময় তাদের গত জন্মের অনুরূপ একটি শরীর প্রদান করা হয়। এই শরীরে যাবতীয় মনুষ্য অনুভূতি তারা অনুভব করতে পারবেন বটে তবে এই শরীর ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। নরকে আপনাদের কর্ম ফল ভোগের সময় এই শরীরেই সকল যন্ত্রনা অনুভব করবেন আপনারা।”

কথাগুলো বলার সময় এমন এক অদ্ভুত ক্রুরতা বক্তার কণ্ঠে ফুটে ওঠে যে সমস্ত মাঠ এক মুহুর্তে নীরব হয়ে যায়। আবারও সেই সুবিশাল স্ক্রিনে মুখোশ ধারী বক্তা বলতে শুরু করেন,

“নিজ নিজ কর্ম অনুসারে এই নরকে আপনারা কর্ম ফল ভোগ করবেন। তবে আপনাদের কাছে সুযোগ থাকবে পরবর্তী জন্মে আপনি কি হবেন তা নির্ধারণ করার। এই কর্ম ফল আপনারা ভোগ করবেন যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নরকে আমরা তাকে বলি, কর্ম যজ্ঞ।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই কর্ম যজ্ঞের তিনটি পর্যায়। একেকটি পর্যায় বা ধাপে আপনার ভ্রম শরীরটি বিনষ্ট হলে পরের জন্মে একেকরকম যোনি প্রাপ্ত হবেন আপনি। একটি ধাপ থেকে আরেকটি ধাপে যাওয়ার জন্য আছে বেশ কিছু নিয়ম এবং উপায়।”

মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকে আবারও একে অপরকে দেখতে থাকে। সকলের মুখেই ফুটে উঠছে অপার বিস্ময়। কী হতে চলেছে কেউই যেন ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছে না।

“কর্ম যজ্ঞের প্রথম পর্যায় শুরু হতে চলেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই পর্যায়ে আপনার ভ্রম শরীরটি বিনষ্ট হলে আপনি নিম্ন যোনি প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ আপনার জন। হবে কোনো মনুষ্যেতর জন্তু হিসেবে। কতক্ষণ সময় পরে আপনার ভ্রম শরীর নষ্ট হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে আপনার পরবর্তী জন্ম। তবে এই নিম্ন যোনি লাভের থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায়ও আছে।”

বক্তার কণ্ঠে এইবার খেলা করে একটা রহস্যময় হাসি। পরক্ষণেই মাঠের চারপাশে আচমকাই যেন শয়ে শয়ে আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় এতক্ষণ অন্ধকারে ঢাকা প্রান্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। সব্যসাচী দেখে এই মাঠের চারিদিকে শয়ে শয়ে বাড়ি। আর প্রত্যেকটি বাড়ির উপরে টাঙানো আছে একটা বিশেষ সংখ্যা। এই অদ্ভুত বিশাল বিশাল ইমারত গুলো দেখে সব্যসাচীর বুকের ভেতর কেমন যেন অদ্ভুত আশঙ্কা দানা বাঁধে। ঠিক কী হতে চলেছে এখানে!

সেই গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ পুনরায় বলে ওঠে, “কর্ম যজ্ঞের প্রথম পর্যায় শুরু হলে আপনাদের হাতের বন্ধন খুলে দেওয়া হবে। এই মাঠের চার প্রান্তে যে বাড়িগুলো দেখছেন এর মধ্যে কোনো একটি বাড়ির কোনো একটি ঘরে আপনার জন্য রাখা আছে পরবর্তী পর্যায়ের প্রবেশপত্র। নিশ্চয়ই ভাবছেন কোন বাড়িতে আছে আপনার জন্য প্রবেশ পত্রটি?”

বক্তা এইবার কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। ফের বলেন, “আপনার পিঠে খোদাই করে লেখা আছে একটি বিশেষ সংকেত। সেই সংকেতটির মর্মোদ্ধার করতে পারলেই আপনি বুঝতে পারবেন এর মধ্যে কোন বাড়িতে আপনার জন্য রাখা আছে আপনার প্রবেশ পত্র। তবে সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই প্রত্যেক জীবাত্মা

কেবল তার নিজের জন্য নির্ধারিত বাড়িতেই প্রবেশ করতে পারবেন। অন্য বাড়িতে প্রবেশ করা তার পক্ষে সুখকর হবে না।

শুধু তাই নয় এই পর্যায়ে নিজের প্রবেশ পত্রটি খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময় দান করা হবে। আপনাদের গলদেশে যে বন্ধনী আবদ্ধ রয়েছে তাতেই আপনার জন্য নির্ধারিত সময় দেখা যাবে। বলাই বাহুল্য কার জন্য কতখানি সময় আছে তা নির্ধারিত হয়েছে তাদের কর্মের উপর ভিত্তি করে। এই সময়ের মধ্যেই নিজ নিজ প্রবেশ পত্রটি খুঁজে বের করতে হবে আপনাদের।”

“আর যারা এই সময়ের মধ্যে ওটা খুঁজে বের করতে পারবে না তারা?" মাঠের মধ্যেই একজন চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু কী অদ্ভুত! এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আসে না। চারিদিকে বিরাজ করে অদ্ভুত নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবারও সেই মুখোশ ধারী বক্তা বলে ওঠে, “অতঃপর কর্ম যজ্ঞের প্রথম পর্যায় শুরু হচ্ছে। সকলকে আগাম শুভ কামনা জানাই।”

বিশাল স্ক্রিনে এইবার নেমে আসল অন্ধকার। পরক্ষণেই একসঙ্গে যেন শয়ে শয়ে শঙ্খ বেজে উঠল চারিদিক থেকে। আর ঠিক তারপরেই সব্যসাচী খেয়াল করল ওর হাতের সেই ধাতব বন্ধনটি আপনা থেকেই খুলে গেল। শুধু ওর নয় সকলের বন্ধনীই খুলে গেছে। সকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দারাচ্ছে। এর ওর সঙ্গে কথা বলছে।

সকলের মুখেই চাপা উত্তেজনা। ঠিক এই মুহূর্তেই একবার সমবেত ঘন্টা ধ্বনির শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। আর ঠিক তখনই সব্যসাচী খেয়াল করল সকলের গলার কলার গুলোতে ফুটে উঠেছে একেকটা সংখ্যা। ঠিক যেন প্রত্যেকটা কলারে একটা ছোট্ট ডিজিটাল ঘড়ি লাগানো আছে। লাল অক্ষরে তার সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য সেই কলারে ফুটে ওঠা সময় কিন্তু বাড়ছে না, ক্রমশ কমছে!

****

“এই যে ছোঁড়া তোমার তো অনেকক্ষণ সময় দেখছি। এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট। অনেক পূণ্য করেছ বুঝি!”

কিছুক্ষণ আগের সেই বৃদ্ধ কখন যেন সব্যসাচীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখে চোখে তার একরাশ বিরক্তি। সেই নিয়েই তিনি বললেন, “দেখো তো আমার কতটা টাইম?”

সব্যসাচী এইবার ওনার কলারের দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। কোনোমতে ও বলল, “কুড়ি সেকেন্ড। আপনার কলারে কুড়ি সেকেন্ড চলছে।”

“কুড়ি সেকেন্ড! এ কী এত কম! এত কম সময় কেন? এ তো ঘোর অন্যায়। তোমায় এত সময় দিয়েছে আমায় এত কম কেন। এ তো অনুচিত। কী পাপ করেছি আমি...”

দুম!

কথাটা শেষও করতে পারেননি বৃদ্ধ তার আগেই একটা কান ফাটানো শব্দে আরও এক আর চারিদিক কেঁপে উঠল যেন। সব্যসাচী কাঁপতে কাঁপতে দেখল কিছুক্ষণ আগেই ওর সামনে দাড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে চারদিকে।

ঠিক যেন ওনার শরীরের ভিতরে একটা বোমা লাগানো ছিল। সময় হতেই সেই বোমাটা ফেটে গিয়ে...

দুম! দুম! দুম!

চারপাশে পরপর এরকম আরো কতকগুলো শরীর মুহূর্তের মধ্যে বোমার মত ফাটতে লাগল। সব্যসাচীর হাত পা কাঁপছে। চারিদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত। রক্ত আর রক্ত। সবাই চিৎকার করছে। পাগলের মত ছুটছে। কেউ আতঙ্কে কাঁদছে। হে ঈশ্বর কী হচ্ছে এখানে! হে ভগবান।

ঠিক এই সময় একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে ওর সম্বিৎ ফিরল। সেই মেয়েটা। শান্ত ধীর স্থির মেয়েটা। ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর দিকে পিছন করে এইবার নিজের জামাটা তুলে ধরল। তারপর বলল, “কী লেখা আছে ঝটপট বলো।”

সব্যসাচী লেখাটা পড়ে ঝটপট বলে, “জলের ওপর পানি না পানির উপর জল?”

মেয়েটার চোখ কুঁচকে যায়। কী যেন ভাবে সে। পরের মুহূর্তেই সব্যসাচীর পিছনে গিয়ে ওর জামাটা তুলে ধরে ও। তারপর বলে, “তোমার সংকেত, একবার না পারিলে দেখ শতবার!”

সব্যসাচী কিছু বলতেই যাবে তার আগে মেয়েটা বলে ওঠে, “তাড়াতাড়ি করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বাড়ি খুঁজে বের করো। এক্ষুনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। আর তারপর ওরা চলে আসবে...”

মেয়েটা আর দাঁড়ায় না। দৌড় দেয় বাড়িগুলোর দিকে। কিন্তু ওর কথাগুলোর মানে কী? বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে? ওরা চলে আসবে? মানে!

ঠিক এই মুহূর্তেই মাথার উপর প্রচন্ড জোরে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সব্যসাচী অবাক হয়ে তাকায় উপরের দিকে। নরকেও কি বৃষ্টি হয়? উপর থেকে এইবার একটা বৃষ্টির ফোঁটা ওর গায়ে এসে পড়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর সারা শরীর প্রচন্ড যন্ত্রণায় যেন জ্বলে পুড়ে যায়। উহু এ কোনো সাধারণ বৃষ্টি নয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে পড়ছে সাক্ষাৎ অ্যাসিডের মত কোনো তরল। নিজের চামড়ার দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে ও। ওই তরল চামড়া ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রচন্ড যন্ত্রণায় এখনও হাত জ্বালা করছে ওর।

সব্যসাচী এইবার বুঝতে পারে ওর কর্তব্য কী! বাড়ি! ওকে বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। ওর নিজের বাড়ি। কিন্তু এর মধ্যে কোন বাড়িটা হবে ওর? এই অল্প সময়ে কী করে খুঁজে বের করবে ও। উঁহু ও চায় না কুকুর ছাগল হয়ে জন্ম নিতে। ও পরের জন্মেও চায় মানুষ হতে। শুধু মানুষ নয়, ধনী বিপুল ধনী একজন মানুষ। একবার না পারিলে দেখ শত বার! এর মানেই বা কি?

সব্যসাচী এইবার পাগলের মত ছুটতে শুরু করে। ঠিক যেমন ভাবে বাকিরা ছুটছে। শুধু তো ছুটছে না। পাগলের মত যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। কারণ বৃষ্টি আসছে। ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! যে বৃষ্টিতে সমস্ত কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

ওই মেয়েটা কি বলল যেন! প্রথমে বৃষ্টি শুরু হবে। তারপর ওরা আসবে। ওরা কারা? কাদের কথা বলছিল মেয়েটা! আচ্ছা ও এসব আগে থেকে জানলই বা কী করে? ও কী এর আগেও এখানে এসেছিল!

কিন্তু তা কী করে সম্ভব!

তৃতীয় অধ্যায়

॥ কর্ম যোগ ॥

চিৎকার! চারিদিক থেকে ভেসে আসছে ভয়ঙ্কর চিৎকার। শয়ে শয়ে মানুষ প্রচন্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুহুর্মুহু ভেসে আসছে কানে তালা লাগানো সেই শব্দ!

বুম!

একের পর এক মানুষের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছিটকে যাচ্ছে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। চারিদিকে কেবল রক্ত আর রক্ত। তার উপর এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টি। ক্রমশ যেন বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। আর আকাশ থেকে ঝরে পড়া প্রত্যেকটা ফোঁটা একটু একটু করে দগ্ধ করছে এই মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকের শরীর।

শরীর? নাকি ভ্রম? সব্যসাচী এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। যদিও ও নিজেও বাকিদের মতই পাগলের মত ছুটছে। আর প্রচন্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে। এই যন্ত্রনা বেঁচে থাকার সহস্র যন্ত্রনার থেকেও কষ্ট দায়ক যেন।

প্রত্যেকটা বাড়ির সামনেই একটা অত্যাধুনিক স্ক্রিন লাগানো আছে। সেখানে হাত রাখলেই সেই স্ক্রিনের উপরে দেখা যাচ্ছে সেই বাড়িটি নির্দিষ্ট জীবাত্মার জন্য কিনা। এরমধ্যে অনেক গুলো নম্বরের বাড়ীতেই হানা দিয়েছে সব্যসাচী। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সব জায়গাতেই সেই স্ক্রিনে হাত দেওয়া মাত্র ফুটে উঠেছে একটাই বার্তা, “প্রবেশ নিষিদ্ধ”।

একবার না পারিলে দেখো শত বার! এই ছোট্ট একটা লেখা থেকে ও কিভাবে বুঝবে এর মধ্যে কোন বাড়িটা ওর জন্য নির্ধারিত। এখানে চারপাশে এতগুলো বাড়ি সার দিয়ে পরপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যে, ও এক সপ্তাহ ধরে খুঁজলেও যে সঠিক বাড়ি খুঁজে পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাহলে?

প্রথমে ও ভাবছিল একশো নম্বর বাড়িটা হয়তো ওর জন্য নির্ধারিত হতে পারে। কারণ কথাটার মধ্যে এই একটা সংখ্যারই উল্লেখ আছে। কিন্তু না! সেখানে গিয়েও কোনো লাভ হল না। তারপর অন্য বাড়ি। ওর নিজের বয়স,

নিজের জন্ম সাল, নিজের জন্ম মাস, এমনকি এটিএমের পিন সমস্ত কিছুই চেষ্টা করে দেখেছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো লাভ হয়নি।

ওর জন্য নির্ধারিত বাড়ি এখনও সব্যসাচী খুঁজে পায়নি। এইদিকে প্রতি মুহূর্তে সময় কমে আসছে। প্রথমটা সব্যসাচী ব্যাপারটা নিয়ে অত ভাবিত হয়নি। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, যত ও বুঝতে পারছে সবটা ততই পরের পর্যায়ে যাওয়ার ওর খিদে বাড়ছে।

সত্যিই যদি এটা নরক হয়, সত্যিই যদি এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা ভোগ করে ওকে পরের জন্মে যেতে হয় তাহলে কেন ও নিজের জন্য সবচাইতে সেরাটা বেছে নেবে না। কেন ও যা যা চায় সেগুলো পরের জন্মে হবে না? অনেকেই মাঝপথে হাল ছেড়ে দিলেও ও কেন এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে? এই ক্ষেত্রেও ও অন্তত ব্যর্থ হতে চায় না।

সব্যসাচী একবার চারিদিকটা ভালো করে চেয়ে দেখল। কেউ কেউ যে নিজেদের বাড়ি এর মধ্যে খুঁজে পায়নি তা নয়। অনেকেই এর মধ্যে নিজেদের বাড়ির ভিতর ঢুকেও গেছে। যেমন ওই মেয়েটি যে একটু আগেই ওর সঙ্গে কথা বলল, সেও তো কিছুক্ষণ আগেই একটা বাড়ির মধ্যেই গিয়ে ঢুকল। একটু চেষ্টা করলে তার মানে সব্যসাচীও ঠিকই পাবে।

"হে ঈশ্বর, সহায় হও। পথ দেখাও।" কথাগুলো নিজের মনে মনে বলতে বলতেই দৌড়াচ্ছিল সব্যসাচী, আচমকাই একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একেবারে হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল ও।

"দেখে চলতে পারো না! স্কাউনড্রেল।" গায়ে লাগা মাটিটা ঝাড়তে ঝাড়তেই লোকটা উঠে দাড়াল। তারপর সব্যসাচীর দিকে তাকিয়েই বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "কোথা থেকে সব চলে আসে। এদের জন্যই দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে দিন দিন। যত্তসব।"

শেষের কথাগুলো কেমন যেন কানে বাজল সব্যসাচীর। ঠিক এই কথাগুলোই ও যেন আগেও শুনেছে। কিছুদিন আগেই। কোথায় শুনেছে...কোথায় শুনেছে...

মাথায় একটু চাপ দিতেই দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। নীল দেওয়ালের ছোট্ট একটা ঘুপচি ঘর। ভিতরে একটা টেবিল পাতা। টেবিলের

এক প্রান্তে তিনটে লোক। অপর প্রান্তে সব্যসাচী নিজে বসে আছে। ইন্টারভিউ চলছে। উল্টো পিঠের লোকটা আচমকাই গর্জে উঠল,

“এই নিয়ে এটা তোমার কত নম্বর ইন্টারভিউ?”

“বত্রিশ স্যার।”

“এর আগের একত্রিশটা ইন্টারভিউর কোনোটাতেই হয়নি?”

“না স্যার।”

আচমকাই উল্টো পিঠের লোকটা হাতে ধরা কাগজগুলো ছুঁড়ে দেয় সব্যসাচীর মুখের উপর। তার পর বলে ওঠে, “হবেও না কোনোদিন। না বলতে জানো ইংরেজি ঠিক করে, না আছে স্মার্টনেস। সামান্য কথা গুছিয়ে বলতে গেলেও হাজারবার ঢোক গেলো। কেন তোমাকে চাকরি দেবে কেউ! গেট আউট। গো গ্রুম ইয়োরসেলফ। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ আমাদের। কোথা থেকে সব চলে আসে। এদের জন্যই দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে দিন দিন। যত্তসব।”

ফ্যাকাশে মুখ নিয়েই কোনোমতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায় সব্যসাচী। কোনোমতে কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের ফাইলটা গুছিয়ে নিয়ে পা বাড়ায় দরজার দিকে তখনই পেছন থেকে আরেকজনের কণ্ঠ ভেসে আসে, “এক্সকিউজ মি!”

সব্যসাচী পিছন ফিরে তাকায়। ইন্টারভিউ বেঞ্চের সবচাইতে ডানদিকে বসে থাকা শীর্ণকায় বয়স্ক লোকটি ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসেন। ভদ্রলোকের সামনে ছোট্ট রুপোলি ফ্রেমে ওনার নামটি লেখা আছে। মাধব চক্রবর্তী।

“মিস্টার সব্যসাচী ঘোষাল রাইট?”

“ইয়েস স্যার।”

“শোনো হাল ছেড়ো না।”

লোকটার কথা শুনে অবাক হয় সব্যসাচী। ওর বিস্মিত মুখের ভাবখানা দেখেই বোধহয় বয়স্ক লোকটি পুনরায় হাসেন। ফের বলেন, “দেখো সব্যসাচী, জীবনে বারবার ব্যর্থতা আসবে। কেউ একবার ইন্টারভিউ দিয়েই ক্র্যাক করে, কেউ একশো বারে। সবার জার্নিটা সমান নয়। সো জীবনে যে পজিশনেই থাকো না কেন, হাল ছেড়ো না। বেটার লাক নেক্সট টাইম। একবার না পারিলে দেখো শতবার!”

সব্যসাচী এইবার কাঁপতে কাঁপতেই উঠে দাড়ায়। ঠিকই তো এই ইন্টারভিউটার কথা ও কী করে ভুলে গেল। ওই বয়স্ক লোকটার কথাগুলোকে নেহাৎ শুকনো জ্ঞান বলে ও ভুলে গেলেও, ওই ইন্টারভিউয়ারের অপমান! সে তো ওর মনের মধ্যেই গেঁথে ছিল। এমনকি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

তাহলে এই ইন্টারভিউয়ের কথাই ইঙ্গিত করা আছে ওই সংকেতে। এটা ওর বত্রিশ নম্বর ইন্টারভিউ ছিল। তারমানে বত্রিশ নম্বর বাড়িটাই কি ওর জন্য নির্ধারিত? মুহূর্তের মধ্যে শরীরে শিহরণ খেলে যায় সব্যসাচীর। চারিদিকে চোখ বোলাতেই বত্রিশ নম্বর বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না ওর।

পাগলের মত এবার দৌড় দেয় ও সেইদিকে। একসময় দৌড়াতে দৌড়াতে যখন বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন বাইরে বৃষ্টির বেগ আগের থেকে বেড়েছে। সেই বৃষ্টির স্পর্শে প্রচন্ড যন্ত্রণায় হাহাকার করছে আশেপাশের মানুষেরা।

এরমধ্যেই আচমকাই চারপাশে আবারও একই সঙ্গে প্রবল নিনাদে শয়ে শয়ে ঘণ্টা বেজে উঠল যেন। সব্যসাচী বোঝার চেষ্টা করছে আচমকা আবারও এই ঘন্টা বাজার কারণ কি তার মধ্যেই খুব কাছেই একটা মহিলা কণ্ঠের প্রচন্ড চিৎকারে চমকে উঠল ও।

ওর থেকে অনতিদূরেই এক মহিলা প্রবল আতঙ্কে চিৎকার করছে। কারণ এই মুহূর্তে তার শরীরে কামড় বসিয়েছে এক অদ্ভুত দর্শন জীব। বামনাকৃতি চেহারা। কালো কুচকুচে রং। চোখ রক্তবর্ণ লাল। সারা শরীরে খোঁচা খোঁচা কাঁটার মত। আর মুখে করাতের মতন ধারালো দাতের সারি। দেখলেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ নরকের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ভয়াবহ কোনো পৈশাচিক সত্তা!

কিন্তু এ কি! এরা তো একা নয়। একটা নয়, দুটো নয়, ওরা আসছে শয়ে শয়ে। এবং একের পর এক মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে প্রচন্ড আক্রোশে।

"জীবাত্মাদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে কর্ম যজ্ঞে এই পর্যায়ে মহাবৈরিদের আগমন ঘটেছে। এরা আর কিছুই নয়, মনুষ্য জন্মকালীন শরীরের রজো গুনোদ্ভোব কামনা এবং বাসনা মাত্র।"

মাঠের মধ্যে আবারও সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, স্ক্রিনে আবারও ভেসে উঠল সেই মুখোশধারীর মুখ।

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্

হে জীবাত্মা, জীবদ্দশায় রজো গুণ থেকে উৎপন্ন এই কামনারাই মানুষকে পাপে নিমগ্ন করে। এই কাম বাসনার থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি ঘটে। মানুষের চিরশত্রু এই কামনাই মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণ। জীবাত্মার মনুষ্য জন্মকালীন এই কামনারা যেমন তাদের মুহুর্মুহু দংশন করে, এই নরকেও তেমনই এদের দংশনে আপনারা আপনাদের ভ্রম শরীরে ভয়াবহ বিষাক্ত জ্বালা অনুভব করতে পারবেন। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব এদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিজেদের জন্য নির্ধারিত বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।”

বিরাট স্ক্রিনটি আবারও ডুবে গেল অন্ধকারে। সব্যসাচী দেখল ইতিমধ্যেই ওই ভয়াবহ দেখতে জীবগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের চারদিকে। একের পর এক মানুষকে কামড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছে ওরা। চারপাশে ভয়াবহ বিভৎস চিৎকারে কানপাতা দায়। ঐ তো ওরা ছুটে আসছে ওর দিকেও! ওদের বীভৎস মুখে খেলা করছে একরকম কুটিল হাসি।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের হাতটা বাড়ির দ্বারের সামনে লাগানো স্ক্রিনটায় রাখল সব্যসাচী। ওকে অবাক করে দিয়েই অপরের স্ক্রিনে ভেসে উঠল লাল রঙের লেখা, “প্রবেশ নিষিদ্ধ!”

প্রবেশ নিষিদ্ধ! মানে কী? এখানেও প্রবেশ নিষিদ্ধ? এটা কি করে সম্ভব। সংকেতে লেখা কথাটার মতন ওটা ওর বত্রিশ নম্বর ইন্টারভিউ ছিল। তাহলে তো এই বাড়িটাই হওয়ার কথা নয় কি? কথাটা ভাবতেই চমকে উঠল ও।

তাই তো এই সহজ ব্যাপারটা ও আগে ধরতে পারেনি কেন? সংকেতে তো স্পষ্ট লেখা আছে একবার না পারিলে দেখো শতবার। মানে আরেকবার চেষ্টা করতে হবে। বত্রিশ নম্বর বার ব্যর্থ হলেও তেত্রিশ নম্বর বার আবার চেষ্টা করতে হবে। হিসেব মত বত্রিশ নয়, তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ওর জন্য নির্ধারিত।

চারপাশে আরেকবার চোখ ফেরাতেই অনতি দূরে বাড়িটা দেখতেও পেল সব্যসাচী। মনে মনে এক থেকে তিন গুণলো ও। তারপরই নিঃশ্বাস বন্ধ করেই দৌড় দিল ও।

পাগলের মত দৌড়াচ্ছে সব্যসাচী। কোনদিকে হুশ নেই। যদিও ও বুঝতে পারছে ওর পায়ে, ওর পিঠে, ওর হাতের উপর ধারালো দাঁত গেঁথে দিয়েছে ওই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলো। কিন্তু ওর তো থামার উপায় নেই। যাই হয়ে যাক। ওকে তো ওর কাজ করে যেতেই হবে। ওকে তো ওই তেত্রিশ নম্বর বাড়িতে পৌঁছাতেই হবে! সে যত যন্ত্রনাই হোক।

এক সময়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছায় ও। তারপর নিজের হাত রাখে স্ক্রিনের উপর। এইবার উপরের স্ক্রিনে সবুজ আলোয় দেখা যায় নতুন একটি লেখা, "বাড়ির ভিতরে আপনাকে স্বাগত!"

সব্যসাচীর মুখে হাসি ফোটে। কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে সে প্রবেশ করে বাড়ির ভিতর। ওর রক্তাক্ত শরীরের উপর জাঁকিয়ে বসা ওই জন্তুগুলো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতেই যেন মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠিক যেমন নিষ্কাম কর্মের দ্বারা পুড়ে ছাই হয়ে যায় মনুষ্যের ভোগ বাসনা।

সব্যসাচী দেখে ওর পিছনে বাড়ির দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। এইবার বাড়ির ভিতরে লাগানো একটি বড় স্ক্রিনে আলো ফুটে ওঠে। সেখানে ভেসে ওঠে পাঁচটি ঘোড়ার ছবি। যারা ক্রমাগত ছুটে চলেছে। নেপথ্যে শোনা যায় একটি মিষ্টি মহিলা কণ্ঠ।

"জীবাত্মা, সংখ্যা নয় ছয় নয় কে অভিনন্দন জানাই সঠিক বাড়িতে এসে পৌঁছানোর জন্য। এই বাড়ির একটি ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কর্ম যজ্ঞের পরবর্তী পর্যায়ের প্রবেশ পত্র। তবে তার আগে দরজার পাশে রাখা অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি আপনাকে বেছে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

অস্ত্র? এই বাড়ির ভিতরেও অস্ত্র লাগবে কেন? সব্যসাচীর চোখ যায় এবার দরজার পাশে রাখা বিশাল বাক্সটার দিকে। পাগলের মত ছুটে গিয়ে সেটার উপর ঝুঁকতেই ও দেখে ওটার মধ্যে রাখা বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র, এমনকি বন্দুকও। কিন্তু এই অস্ত্র কী কাজে লাগবে ওর?

কাঁপা কাঁপা হাতেই বাক্সের ভিতর থেকে ও তুলে নেয় একটা ধারালো কুঠার। কিন্তু এটা দিয়ে কাকে মারতে হবে ওকে?

"জীবাত্মা, সংখ্যা নয় ছয় নয় কে নিজের অস্ত্র বেছে নিয়েছেন। এবার আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে নিজের প্রবেশপত্র খোঁজা শুরু করতে। আপনার কাছে আর অবশিষ্ট সময় রয়েছে তেত্রিশ মিনিট তিন সেকেন্ড!"

কথাগুলো ঠিক কানে যায় না সব্যসাচীর। ওর চোখ তখনও আটকে আছে সামনের স্ক্রিনের দিকে। সেখানে পাঁচটা ঘোড়া অনবরত দৌড়েই চলেছে। দৌড়েই চলেছে!

টিভির স্ক্রীনের সামনেই বেশ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মত দাড়িয়েছিল সব্যসাচী। এক মুহূর্তের জন্য ও যেন ভুলেই গেছিল ওকে কী করতে হবে।

প্রবেশ পত্র। এই বিশাল বাড়ির কোথাও, কোনো একটা ঘরে রাখা আছে পরের পর্যায়ের প্রবেশ পত্র। সেটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। হাতে ধরা কুঠারটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ও। তারপর কাঁপা কাঁপা পায়েই এগিয়ে যায় বাড়ির ভিতর।

সব্যসাচী যতই বাড়ির ভেতরে ঢুকছিল ততই যেন অবাক হচ্ছিল। এই বাড়িটা যেন বিশেষ করে ওর জন্যেই বানানো। বাড়িটার প্রত্যেকটা দেওয়ালে একেকটা সুন্দর ছবি টাঙানো। সব ছবিই ওর জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তের।

ওই তো হাসপাতালে ওর জন্মানোর ছবি! সাদা কাপড়ে জড়ানো ছোট্ট সব্যসাচী নরম গোলাপী হাত দিয়ে মাকে ছুতে চাইছে। বাবা বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কী সুন্দর একটা হাসি খেলা করছে মায়ের মুখে।

ওই তো ওই ছবিতে সব্যসাচী শুয়ে আছে ঠাকুমার কোলে। ঠাকুমা বড় ভালোবাসতেন সব্যসাচীকে। তার শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে ছোট বেলায় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন আর কপালে চুমো দিয়ে কী সুন্দর সব গল্প বলতেন। সেই সময় সব্যসাচী বুঝতই না দারিদ্র্য কী জিনিস। ও বুঝত না বড় হতে না হতেই কত দায়ভার ওর পিঠের উপর এসে চাপবে। ওর জীবনটা ছিল নির্মল, শান্তির ও সুখের।

এখন সব্যসাচীর মনে হয় মানুষ যত বড় হয়, ততই যেন বিষন্ন হতে থাকে। আমাদের সকলের ভিতরেই একটা বাচ্চা আছে। যে হাসতে চায়, খেলতে চায়।

দুরন্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে চায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। কিন্তু আমরা যতই বড় হতে থাকি ততই সেই হাসিখুশি বাচ্চাটাকে আমরা নিজের হাতের খুন করি। বিশ্বাসঘাতকতা আর স্বার্থপরতার আঘাতে আঘাতে আমরাও আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাই।

"দাদুভাই!"— আচমকাই অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনে সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে সব্যসাচীর। ও কি ঠিক শুনছে? এই কণ্ঠ কি ওর ঠাকুমার?

সামনের ঘরের ভিতর থেকেই শব্দটা আসছে। তাই না? দৌড়ে গিয়ে দরজায় কান পাতে ও। আবারও স্পষ্ট শুনতে পায় ভিতর থেকে ওর ঠাকুমা ডাকছে, "দাদু ভাই! তুমি এসেছ? একবার দেখা করবে না ঠাম্মির সাথে? আমায় মুক্তি দেবে না!"

কাঁপা কাঁপা হাতেই এইবার দরজাটা খুলল সব্যসাচী। আর সঙ্গে সঙ্গেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল ওর। ও দেখল ওই ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে ওর ঠাকুমা! তার দুই হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা। কিন্তু এ কী! ঠাকুমার সারা গায়ে অজস্র ধারালো ছুরি গাঁথা। সেখান দিয়ে টপ টপ করে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত!

"ঠাম্মি!" এই এত গুলো বছর পর ঠাকুমার মায়া ভরা মুখটা দেখে সব্যসাচীর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল যেন। কোনোমতে সামনে এগিয়ে গেল ও।

"তুমি এখানে এইভাবে..." কথাটা শেষও করতে পারেনি সব্যসাচী তার আগেই ঠাকুমা একপ্রকার ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "আর বলো না দাদুভাই! আজীবন মানুষকে নিজের ধারালো কথায় বিদ্ধ করেছি। কথা বলার আগে একবারও ভাবিনি অন্য মানুষের কেমন লাগবে। তাই আজ নরকে এসে এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা ভোগ করছি। তুমি, একমাত্র তুমিই পারো আমায় মুক্তি দিতে এই যন্ত্রনা থেকে।"

"আমি?" চমকে উঠলো সব্যসাচী।

ঠিক এই সময়েই ঘরের ভিতরে শোনা গেল সেই সুরেলা নারী কন্ঠ।

"জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে, এই মুহূর্তে জীবাত্মা তিন শূন্য পাঁচ কে তিনি তার নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তার নিজের অবশিষ্ঠ সময় থেকে দশ মিনিট তেরো সেকেন্ড সময় কেটে নেওয়া

হবে। তার কাছে পরের পর্যায়ের প্রবেশ পত্র খোঁজার জন্য অবশিষ্ঠ সময় থাকবে কুড়ি মিনিট এগারো সেকেন্ড। নরকে মুক্তি দানের নিয়ম একটাই। মুক্তি প্রদানকারী যাকে মুক্তি দিতে চায় নিজের হাতে তার ভ্রম শরীর তাকে বিনষ্ট করতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত জীবাত্মা মুক্তি লাভ করবে।”

নিজের হাতে ধরে রাখা কুঠারটা এইবার ভালো করে দেখে সব্যসাচী। এই জন্য? এই জন্য তাহলে ওকে কুঠার দেওয়া হয়েছিল। নিজেরই আপন জনের শরীরে এই কুঠার দিয়ে আঘাত করতে হবে বলে?

“সংকোচ করো না দাদু ভাই! তোমার হাতে যে কিছুই নেই। আমি যে মরেই গেছি।” ঠাকুমার কথায় আবারও যেন সম্বিৎ ফেরে সব্যসাচীর। ওর সময় থাকল কি গেল তা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই এই মুহূর্তে। ও মন থেকে চায় ঠাকুমাকে মুক্তি দিতে। কিন্তু কিভাবে... কিভাবে ও নিজের হাতে ঠাকুমাকে আঘাত করবে? যেই মানুষটার বুকে মাথা রেখে দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়েছে ও, আজ কিভাবে নিজের হাতে তার বুকেই গেথে দেবে এই রক্ত পিপাসু কুঠার?

ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠা দ্বন্ধ আর সংকোচ দেখেই বোধহয় বৃদ্ধার মুখে মলিন হাসি ফুটে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠেই তিনি বলেন, “তুমি যা দেখছ বাবা এ সবই মায়া। এই শরীরটাও নেই। এই আমিও নেই। বেঁচে থাকার সময় হাজারও মায়ার বশে মানুষ আসল সত্যিটাই ভুলে যায় যে। এই নরকে এসে সেইটে উপলব্ধি করাই আসল কর্তব্য।”

ঠাকুমার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকায় সব্যসাচী। তারপর বলে, “কোন সত্যি ঠাম্মি?”

“আমাদের হাতে কিছুই নেই দাদু ভাই। জন্ম মৃত্যু কিছু না। সব তেনার হাতে গো... সব তেনার হাতে। তিনি যেমন ভেবে রেখেছেন তেমনি হবে। আমাদের হাতে শুধু আছে কর্ম। তাই আমাদের নিজের কর্মটুকু করে যাওয়া উচিত। ফল উনি নিশ্চিত দেবেন। দেবেনই। ওনার হিসেবে যে কোনো ভুল হয় না।”

“উনি? উনি কে ঠাম্মি?”

এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুমা রহস্যময় হাসি হাসেন। ফের বলেন, “ভাবো দাদুভাই। ভাবো। ভাবলেই পাবে। তবে আমায় এখন মুক্তি দাও। এই যন্ত্রনার থেকে আমায় মুক্তি দাও...যাতে আমি আবার মনুষ্য রূপে জন্ম নিতে পারি...”

হাতের কুঠারটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে সব্যসাচী। বুক ভরে যেন শ্বাস নেয় ও। এই কাজ যে কোনোদিন ওকে করতে হবে তা ও ভাবেওনি। চোখ বন্ধ করেই এইবার সেই ধারালো কুঠারটা বসিয়ে দেয় ঠাকুমার বুকে। রক্ত ছলকে এসে মুখে লাগে সব্যসাচীর।

সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুরেলা মহিলা কণ্ঠ ঘোষনা করে, “জীবাত্মা তিন শূন্য পাঁচকে তার দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হল। এই কর্মের জন্য জীবাত্মা নয় ছয় নয়ের জন্য নির্ধারিত সময় থেকে দশ মিনিট তেরো সেকেন্ড কেটে নেওয়া হল। এই মুহূর্তে তার কাছে এখন অবশিষ্ঠ সময় আছে কুড়ি মিনিট বারো সেকেন্ড!”

****

দৌড়াচ্ছে! সব্যসাচী পাগলের মত দৌড়াচ্ছে। এই বিশাল বাড়ি যেন আস্ত একটা গোলক ধাঁধা। যেই গোলক ধাঁধার প্রত্যেকটা মোড়ে টাঙানো আছে ওর কোনো একটা স্মৃতি। স্মৃতি যা মানুষকে ক্ষত বিক্ষত করে। স্মৃতি যা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় তার কী কী ছিল আর কী কী নেই। স্মৃতি যা প্রত্যেক মুহূর্তে মানুষকে নরক যন্ত্রনা দেয়।

সেইসব স্মৃতি। কোনটা ওর ক্লাসে দারুণ রেজাল্ট করার। কোনটা ওর প্রেমিকাকে প্রথম চুম্বনের। কোনো স্মৃতি ওর খুব কাছের কোনো বন্ধুর যে বিগত বছরগুলোয় একবারও ওর খোঁজ নেয়নি। এই বাড়ির মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে ও যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। এই বাড়ি যেন চায় ওর সমস্ত সময় গিলে খেতে। ওর গতি মন্থর করে দিতে। কিন্তু সময়ের কাঁটা যে টিক টিক করে এগিয়েই চলেছে। এর মধ্যেই যে ওকে ওর কর্ম করতে হবে!

ওর হাতে আর বেশি সময়ও নেই। মাত্র সাত মিনিট পড়ে আছে। চার তলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই মাটির উপর ধপ করে বসে পড়ে ও। ও জানে না এই বাড়ির

কোথায় ওর পরবর্তী পর্যায়ের প্রবেশ পত্র লুকিয়ে আছে। কোনোভাবে সেটা জানা সম্ভবও নয়। ওকে তো এই ব্যাপারে কোনো সংকেতও দেওয়া হয়নি!

সামান্য কোনো সূত্র ছাড়া এই এত বড় বাড়িতে ও কী করে খুঁজে পাবে কোথায় কোন ঘরে ওর প্রবেশপত্র লুকানো আছে!

মাটিতে বসে হাফাতে হাফাতেই ওর চোখে ভেসে ওঠে বাবার করুণ মুখটা। সেই শীর্ণ ক্লান্ত মুখ। ফ্যাকাশে ঠোঁট। শূন্য দৃষ্টি। দৃশ্যটা মনে করলেও বারংবার ভিতর ভিতর শিউরে উঠছে সব্যসাচী। প্রায়ান্ধকার ঘর। তার ঠিক মাঝখানে বাবা মাটিতে শুয়ে আছে।

বাবার পিঠের উপর চাপানো বিশাল বিশাল পাথরের চাই। সাধারণ পাথর নয়। দেখলেই বোঝা যায়, একেকটার ওজন কম করে সত্তর আশি কেজির নিচে তো নয়ই। যদিও পৃথিবীর পরিমাপ নরকেও কাজ করে কিনা জানা নেই সব্যসাচীর।

সেই অসহ্য ভয়াবহ ভারের নিচেই বাবা শুয়ে আছে। কাতরাচ্ছে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায়। সব্যসাচীকে দেখতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল যেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, “আমায় ক্ষমা করে দে খোকন। আমায় ক্ষমা করে দে। তোদের দায়ভার নিয়েও তা পালন না করে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছি। আজ তাই এই নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হচ্ছে। আমায় ক্ষমা করে দে তুই। পারলে এই নরক যন্ত্রনা থেকে আমায় মুক্তি দে।”

বলাই বাহুল্য, বাবার এই ভয়ঙ্কর অবস্থা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি সব্যসাচী। নিজের হাতের কুঠারটা নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বাবার গলায়। নিজের সময় থেকে কমে গিয়েছে আরও অনেক খানি সময়...

তবুও বাবার বলা শেষ কথাগুলো বড় ভাবাচ্ছে ওকে। দৃশ্যটা চোখের সামনে বারবার যেন ফুটে উঠছে ওর। নিজের হাতের কুঠারটা তুলে ধরেছে ও। বাবার চোখে মুখে এক অদ্ভুত চাহুনি। হঠাৎই বাবা বলে উঠলেন, “ইন্দ্রিয়! নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে হবে খোকন। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলো নিজেদের মত ছুটে চলেছে বলেই যত সমস্যা। ইন্দ্রিয় সংযম না করলে নরক থেকে মুক্তি নেই!”

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছিল সব্যসাচী। পরের মুহূর্তেই অবশ্য বাবাকে মুক্তি দিয়েছিল ও। কিন্তু কী বলতে চাইল বাবা? বাবা কী জানে কোথায় রাখা আছে ওই প্রবেশ পত্র? বাবাও তো আত্মহত্যা করেছিল। হিসেব মত বাবার তো জানার কথা তাই না? কিন্তু সোজাসুজি বাবা কিছু বলল না কেন?

একমনে এসবই ভাবছিল সব্যসাচী আচমকাই উপরের তলা থেকে ভেসে আসা প্রচন্ড চিৎকারে শিউরে উঠল ও। এক মহিলার কণ্ঠস্বর। প্রচন্ড জোড়ে পাগলের মতন চিৎকার করছেন সেই মহিলা ঠিক যেন তার গায়ে আগুন লেগেছে। উহু! সব্যসাচী যদি খুব ভুল না হয় এই কণ্ঠস্বর তার অতি পরিচিত!

এই কণ্ঠস্বরই ছোটবেলা থেকে পরম যত্নে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছে, এই কণ্ঠস্বরই তাকে বকেছে আবার সকল মন খারাপের সময় হৃদয়ে লাগিয়েছে মলম। মা! এই কণ্ঠস্বর ওর মা ছাড়া আর কারও হতেই পারে না।

সব্যসাচী মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাড়ায়। তারপর পাগলের মত দৌড় দেয় উপরের দিকে! একের পর এক সিড়ি। একের পর এক তলা। কিন্তু মা কোথায়! কোথা থেকে ভেসে আসছে এই ভয়ঙ্কর চিৎকার?

দৌড়াতে দৌড়াতে যখন শেষমেশ ও ঘরটার সামনে উপস্থিত হয় তখন ওর নিঃশ্বাস রীতিমত বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের উপর কেউ যেন ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে রীতিমত। এদিকে অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। ও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওর মায়ের মত মানুষকেও এই নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু কী এমন করেছে মা যার জন্য মাকেও আটকে থাকতে হয়েছে এই ভয়ঙ্কর গোলক ধাঁধায়?

দরজাটা খুলতেই একরাশ কালো ধোঁয়া এসে প্রথমেই ঝাপটা মারল সব্যসাচীর মুখে। পরক্ষণেই ওর সারা শরীর যেন ঠান্ডা হয়ে গেল এক মুহূর্তেই। ওর চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওর মা। তার সারা শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ভয়ঙ্কর আগুন! কিন্তু কী অদ্ভুত! সেই আগুনে মায়ের সারা শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কিন্তু আগুনের প্রভাবে শরীরের কোনো বিকৃতি ঘটছে না।

এ যেন এমন এক সর্বগ্রাসী আগুন যা কখনও নেভে না, শুধু জ্বলতে থাকে, জ্বালাতে থাকে।

"মা!" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠেই ডাকে সব্যসাচী।

"খোকন তুই এসেছিস!" আগুনের মধ্যে পুড়তে পুড়তেই যেন হরিদাসীর মুখে এক অদ্ভুত বেদনাতুর হাসি ফুটে ওঠে। এত দিন পর ছেলেকে দেখার আনন্দ নাকি এত শীঘ্র ছেলের মৃত্যুর শোক কোনটা যে তাকে গ্রাস করেছে সেই অদ্ভুত অভিব্যক্তি দেখে তা বোঝা অসম্ভব।

"মা তুমি এখানে! কেন কিভাবে?" সব্যসাচীর ইচ্ছে করছে এই আগুনের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে, মাকে জড়িয়ে ধরতে।

"হিংসে...হিংসে খোকন। এই আগুন ঈর্ষার। তুই বুঝিসনি হয়তো, কিন্তু বেঁচে থাকতে তোর ছোট মাসীকে আমি অসম্ভব হিংসে করতাম। কেন ও সরকারী চাকরিওয়ালা বর পেল, কেন অত বড় ঘর পেল। কেন ওর এমন সুন্দর সংসার হল। ওর ছেলে কেন অত বড় চাকরি পেল অথচ তুই পেলি না।

বেঁচে থাকতে হিংসেতে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম খোকন। এই হিংসার বশে আমি গোপনে ওদের অনেক ক্ষতি করারও চেষ্টা করেছি। তার শাস্তিই আমি এই নরকে ভোগ করছি। এই আগুন থেকে আমার মুক্তি নেই!"

"না! আমি আছি তো। আমি তোমাকে মুক্তি দেব। চিন্তা নেই। আমি তো বাবাকে, ঠাকুমাকেও মুক্তি দিয়েছি..."

সব্যসাচী কথা শেষও করতে পারেনি তার আগেই সেই সুরেলা নারী কণ্ঠের আওয়াজ আবার শোনা যায়, "জীবাত্মা দুই পাঁচ ছয়কে মুক্তি দান করলে জীবাত্মা নয় ছয় নয়ের অবশিষ্ঠ বাকি সময় অবিলম্বে কেটে নেওয়া হবে। এর অর্থ জীবাত্মা নয় ছয় নয়ের ভ্রম শরীর অবিলম্বে নষ্ট হবে এবং তিনি এই পর্যায়েই ভ্রম শরীর বিনষ্ট হওয়ার কারণে পরবর্তী জন্মে মনুষ্যেতর প্রাণী হয়ে জন্মলাভ করবে।"

"না!" আচমকাই মায়ের চিৎকারে চমকে ওঠে সব্যসাচী। ওকে চমকে দিয়েই মা বলে ওঠে, "আমাকে মুক্তি দিতে হবে না খোকন! আমি আমার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। আমার জন্য তোকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

তুই পরের পর্যায়ে যাওয়ার প্রবেশ পত্র খোঁজ। আবার মানুষ হয়ে জন্ম নে খোকন। মনুষ্য জন্ম পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার!”

সব্যসাচী যেন পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনেই ওর মায়ের শরীর আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। মা যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন তবু তার মুখের দিকে চেয়ে মা মুক্তি চায় না। মা চায় খোকন যাতে আবার মানুষ হয়ে জন্মায়! মা কি পাগল হয়ে গেছে? মৃত্যুর পরেও এতখানি মায়া!

“না! তোমায় এভাবে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। আর তাছাড়াও ওই প্রবেশ পত্র কোথায় আছে আমি জানি না। এইটুকু সময়ে খুঁজেও পাব না। তার থেকে তোমাকে মুক্তি দেওয়া অনেক অনেক জরুরী আমার কাছে।”

কুঠার হাতেই সব্যসাচী এইবার এগিয়ে যায় মায়ের দিকে। ঠিক তখনই হরিদাসী বলে ওঠেন, “ঘোড়া! এই বাড়ির যেইখানে পাঁচটা ঘোড়ার ছবি দেখতে পাবি ওর পিছনেই তোর প্রবেশ পত্র দেওয়া আছে খোকন। এখনও সময় আছে। খুঁজলেই পাবি। আমায় মুক্তি দিতে হবে না, যা তুই!”

হরিদাসীর কথা শেষ হওয়া মাত্রই সারা ঘর জুড়ে এক অদ্ভুত সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যায়। আবার সেই নারী কন্ঠ শোনা যায় ঘরের ভিতর,

“জীবাত্মা দুই পাঁচ ছয়, জীবাত্মা নয় ছয় নয়কে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় প্রবেশ পত্র রাখা আছে। শর্ত অনুযায়ী হয় তিনি নিজের জন্য মুক্তি চাইতে পারতেন অথবা এই প্রবেশ পত্রের স্থান জানাতে পারতেন। যেহেতু তিনি দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিয়েছেন সেই জন্য তার ফলস্বরূপ তার দন্ড আরও বর্ধিত হল। এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাকে এই নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। জীবাত্মা নয় ছয় নয়কে অবিলম্বে এই ঘর ছাড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।”

সব্যসাচীর সারা শরীর যেন পাথর হয়ে গেছে। ও শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মায়ের দিকে তাকিয়ে। মায়ের চোখে এক অদ্ভুত যন্ত্রনা মেশা আনন্দ। তার মানে এর আগে বাবা, ঠাকুমা ওরাও জানত এই প্রবেশ পত্রের কথা। কিন্তু কেউ বলেনি। সবাই শুধু নিজের মুক্তিই চেয়েছে। কেউ চায়নি এই নরক যন্ত্রনা আর ভোগ করতে।

কিন্তু মা! নিজের এই অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করতে হবে জেনেও... বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল সব্যসাচীর। পরমুহূর্তেই কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন

সজোরে ধাক্কা দিল ওর বুকে। ছিটকে এসে বাইরে পড়ল ও। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতর প্রচন্ড আগুনের হল্কা বয়ে গেল যেন।

কিন্তু কী অদ্ভুত! এই আগুনে যেন মায়ের কিছুই হল না। ওর মুখের সামনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় ও শুধু দেখল আগুনে পুড়তে পুড়তেই মা হাসছে! সেই মলিন বেদনাতুর হাসি।

মায়েরা বুঝি এমনই হয়। হাজারও আগুনে পুড়ে গেলেও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা এমন ভাবেই হাসেন যেন কিছু তো হয়নি। কিছু তো হয়নি...

****

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও ঘরের বাইরেই কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়েছিল সব্যসাচী। আচমকাই ওর সম্বিৎ ফিরল সেই নারী নারী কণ্ঠের আওয়াজে।

“জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে তার হাতে আর মাত্র দুই মিনিট অবশিষ্ট আছে প্রবেশপত্র খুঁজে বের করার জন্য! আর মাত্র দুই মিনিট!”

দু’মিনিট। দু’মিনিট। মুহূর্তের মধ্যে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল শরীরটা। আর সময় নষ্ট করল না সব্যসাচী। মায়ের এত বড় আত্মত্যাগ বিফলে যেতে পারে না। ওকে যেভাবেই হোক পরবর্তী পর্যায়ে যেতেই হবে। ঘোড়া। ঘোড়ার ছবি কোথায় আছে ও তো দেখেছে। এই বাড়িতে ঢুকেই যে ঘরটা সেখানেই তো ওই টিভি স্ক্রিনে...

আর দেরি করে না সব্যসাচী। পাগলের মত সিড়ি দিয়ে নিচের তলায় দৌড় দেয় ও। যখন ঠিক দোতলায় তলায় এসে পৌঁছেছে তখনই আবার ঘোষনা হয়।

“জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে তার হাতে আর মাত্র এক মিনিট অবশিষ্ট আছে প্রবেশ পত্র খুঁজে বের করার জন্য! আর মাত্র এক মিনিট!”

নিজের সর্বশক্তি লাগিয়ে দেয় সব্যসাচী। শেষ কয়েকটা সিড়ি থেকে তো রীতিমত গড়াতে গড়াতেই মাটিতে এসে পড়ে ও। তারপরেও কোনোমতে ছুটে যায় ওই টিভি স্ক্রিনের দিকে। কলারের ঘড়িতে তখনও টিকটিক চলছে।

এক মুহূর্তে টিভিটা খুলে ফেলে সে। তার পিছনেই রাখা সাদা খামটা দেখতে পায় এবার ও। মুহূর্তের মধ্যে ওটা খুলতেই ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা কার্ড।

ঠিক এই মুহূর্তে আবার সেই মহিলা কণ্ঠে ঘোষনা শোনা যায়, "জীবাত্মা নয় ছয় নয়কে জানাই অভিনন্দন। আপনি সফল ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের প্রবেশ পত্র খুঁজে পেয়েছেন। কর্মযজ্ঞের পরবর্তী পর্যায়ে আপনাকে স্বাগত জানাই।"

আচমকাই সব্যসাচী অনুভব করে ওর চোখের সামনে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সব আলো যেন নিভে আসছে ঠিক যেমনটা হয়েছিল ওর মৃত্যুর সময়...

চতুর্থ অধ্যায়

॥ জ্ঞান যোগ ॥

"জীবাত্মা নয় ছয় নয়কে কর্মযজ্ঞের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাগত জানাই!"

চোখে আচমকা অনেক খানি আলো একসঙ্গে এসে পড়লে মানুষ যেমন চোখ খুলতে পারে না, সব্যসাচীও তেমনই প্রথমটা চোখ খুলতে পারছিল না। যখন চোখ খুলল ওর কথা যেন বন্ধ হয়ে এল।

ও দেখল একটা বিশাল উচু কালো বিল্ডিং আকাশের দিকে মাথা তুলে ওর সামনে দাড়িয়ে আছে। তার গেটের সামনে দাড়িয়ে আছে দুইজন অদ্ভুত মুখোশ ধারী প্রহরী। মুখোশ গুলি মহিষ জাতীয় প্রাণীর আদলে গড়া। আর বিল্ডিং এর উপর বড় বড় করে লেখা "চিত্রগুপ্তের দপ্তর"!

নিজের দিকে তাকিয়েও চমকে উঠল ও। উঁহু সারা শরীরে আগের কোনো ক্ষত নেই। বরং ওর পরনে হালকা নীলচে রঙের পোশাক। ওর মুখের সামনেই এইবার বিশাল ইমারতের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

চারিদিকে এত আলো যে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না এই সামনের ইমারতটা ছাড়া। অতঃপর গুটি গুটি পায়ে সেই বিশাল ইমারতের ভেতরেই প্রবেশ করল সব্যসাচী।

ভিতরে ঢুকতেই যে জিনিসটা ওর চোখে পড়ল সেটাকে একটা লিফট বলা যায়। সেটার ডানপাশে একটা কালো স্ক্রিন। তারউপর সিসিটিভি ক্যামেরা। একটু এগিয়ে সেটার সামনে দাড়াতেই সেই স্ক্রিনে ওর ছবি ভেসে উঠল। একটি যান্ত্রিক পুরুষ কণ্ঠ এইবার বলে উঠল,

"অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় বলুন। কর্মযজ্ঞের প্রথম পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন অর্থাৎ আপনি এইবার মনুষ্য জন্ম লাভ করার অধিকারী। তবে সেই মনুষ্য জন্ম কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে। চিত্রগুপ্তের দপ্তরে। আপনার পরিচয় প্রদান করুন। সেই অনুযায়ী আপনাকে নির্দিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে।"

কয়েক মুহূর্ত কী একটা যেন ভাবল সব্যসাচী। তারপর পরিষ্কার কণ্ঠেই বলল, "আমার কোনো পরিচয় নেই। আমার পরিচয় আপাতত একটাই। আমি জীবাত্মা। সংখ্যা নয় ছয় নয়!"

সব্যসাচী দেখল লিফটের গেটটা এইবার ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। কে জানে আর কি অপেক্ষা করছে ওর জন্য!

লিফটের দরজাটা খুলে যেতেই সব্যসাচী এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল যেন। সেই মেয়েটা। আগের পর্যায়ে যে ওর পিঠে লেখা সংকেতটা বলে দিয়েছিল। ঘাড় অব্দি ছোট করে কাটা চুল। মায়াময় মুখ। ওই মেয়েটাও দাড়িয়ে আছে লিফটের মধ্যেই।

একটু ইতস্তত করেই লিফটের ভেতর পা বাড়াল সব্যসাচী। সঙ্গে সঙ্গেই একটি যান্ত্রিক পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, "জীবাত্মা নয় ছয় নয়, গন্তব্য দপ্তর এক শূন্য তিন!"

"আমরা এখন কোথায়?" খানিকটা ইতস্তত করেই প্রশ্নটা এবার জিজ্ঞেস করল সব্যসাচী।

"চিত্রগুপ্তের দপ্তর। এখানে তোমার বিচার হবে। আদৌ তুমি এই মুহূর্তে পুনর্জন্মের অধিকারী নাকি তোমার পাপ স্খলন প্রয়োজন। এইসব আর কি..."

সব্যসাচী মেয়েটাকে এইবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখছিল। ভাবতেই অবাক লাগে। কী এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে এই মেয়েটিকেও আত্মঘাতী হতে হয়েছে?

“তুমি এসব আগে থেকে কী করে জানো? তুমি কি এখানে আগেও এসেছ?”

সব্যসাচীর কথায় মেয়েটা এবার আচমকাই খিলখিল করে হেসে ওঠে। সব্যসাচীর মনে হয় মেয়েটার হাসির মধ্যেও যেন এক প্রকার নিষ্পাপ সারল্য লুকিয়ে আছে। হাসতে হাসতেই মেয়েটা বলে, “শুধু আমি না। তুমিও এসেছ। একবার নয় কয়েক হাজার বার। শুধু তোমার মনে নেই। এই যা।”

“তোমার মনে আছে কী করে?”

সব্যসাচীর এই প্রশ্নে মেয়েটা যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়।

“কেউ কেউ থাকে যাদের সব মনে থেকে যায়। জন্মের পর জন্ম। মৃত্যুর পর মৃত্যু। নরকে আমাদের মত মানুষদের বলে যোগী।”

“সেটা কিভাবে সম্ভব হয়?”

সব্যসাচীর প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই লিফটটা এবার ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। পরক্ষণেই সেই যান্ত্রিক পুরুষ কণ্ঠ ফের শোনা যায়, “দপ্তর এক শুন্য তিন। জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে তিনি তার গন্তব্যে এসে পৌঁছেছেন।”

লিফটের দরজাটা এইবার খুলে গেল নিঃশব্দেই। সব্যসাচীও কথা বাড়াল না আর। ঝটপট বেরিয়ে এল লিফট থেকে। শুধু কি মনে হতে মেয়েটার দিকে একবার পিছনে ফিরে তাকাল সে। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এইবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

সব্যসাচী স্পষ্ট যেন শুনল মেয়েটা ওর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, “তাকে জানতে হবে। তাকে জানলে তবেই এই জন্ম মৃত্যুর চক্র ভেদ করা যায়। তাকে জানলে প্রবল আনন্দেও নিরুদ্বেগ থাকে যায়, আবার হাজার যন্ত্রণাতেও মুখে হাসি ফোটে। যাই হোক, পরবর্তী পর্যায়ের জন্য বেস্ট অফ লাক।”

কিন্তু কী অদ্ভুত! মেয়েটা তো লিফটের মধ্যেই দাড়িয়ে আছে। ওর ঠোঁট পর্যন্ত নড়ল না। তাহলে? সব্যসাচী কি ভুল শুনল? নাকি সত্যিই মেয়েটা কথা না বলেও কথা বলতে পারে! এই যোগীরাই বা কারা?

****

একটা চেয়ারের উপর বসে আছে সব্যসাচী। সামনে একটা বড় স্ক্রিন। আর স্ক্রিনের পাশেই যিনি বসে আছেন তার পরনে শ্বেত শুভ্র পোশাক। মুখে একটি কারুকার্য খচিত নারী মুখোশ। মুখোশটিতে মাতৃ সুলভ প্রশান্তির ভাব।

চোখদুটি টানা টানা, কপালে, গালে সুনিপুণ কারুকার্য।তার পাশেই টেবিলের উপর বসে আছে অনেকগুলো বেড়াল। তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সব্যসাচীর উপর।

এইবার মুখোশের আরাল থেকে শোনা গেল এক মধ্যবয়স্কা রমনীর কণ্ঠ,

"জীবাত্মা নয় ছয় নয়। চিত্রগুপ্তের দপ্তরে স্বাগত। কর্ম যজ্ঞের প্রথম পর্যায়ে পেরিয়ে আপনি এখানে এসেছেন। অর্থাৎ আপনি মনুষ্য জন্ম লাভের অধিকারী হয়েছেন। তবে সেটা কত সময়ের ব্যবধানে আপনি পাবেন এবং সেই জন্ম কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে এখানেই!"

সব্যসাচী এইবার শুধু নীরবে মাথা নাড়াল। সেই রমনী এবার একটি বেড়ালের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতেই বললেন, "আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই মোট আঠাশটি প্রধান নরক আছে মনুষ্য জন্মের পাপ স্খালনের জন্য। এছাড়াও আছে অসংখ্য উপনরক এবং প্রেত কূপ। মনুষ্য জন্মকালীন আপনার করা পাপগুলির ফল আপনি সেখানে নির্দিষ্ট কাল ভোগ করবেন। পুরোটাই নির্ভর করবে আপনার পূণ্যফলের উপর।"

ঠিক এই মুহূর্তে সামনের বড় স্ক্রিনে নীল অক্ষরে কতগুলো লেখা ভেসে উঠল। সব্যসাচী দেখল সেখানে বড় বড় করে কতকগুলো সংখ্যা লেখা। সেই সংখ্যার দিকে তাকিয়েই মহিলাটি বললেন এবার, "এখানে পূণ্য ফল অঙ্কের আকারে প্রদান করা হয়, একে বলে কর্মাঙ্ক। অনেকটা পরীক্ষার মত। এক্ষেত্রে পূর্ণ মান দুই হাজার। আপনার কর্মাঙ্ক আঠেরশো থেকে দুই হাজারের মধ্যে হলে আপনি খুবই সৎ, ধার্মিক ও পুণ্যবান মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেছেন। এক্ষেত্রে আপনাকে কেবল একটি নরকে পাপ স্খালন করতে হতে পারে।"

মহিলাটির কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে ওনার বলা কথাগুলোই। উনি ফের বলেন, "আপনার কর্মাঙ্ক পনেরশো থেকে আঠেরশো মধ্যে হলে আপনি সৎ এবং ধার্মিক বটে তবে আপনার দ্বারা কিছু পাপ কার্য

অজ্ঞাতে সাধিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি নরকে পাপ স্খালন করতে হবে। এইভাবেই আপনার কর্মাঙ্ক অনুযায়ী আপনার জন্য নরক সংখ্যা নির্বাচিত হয়। এবং আপনার পাপের প্রকৃতি অনুযায়ী কোন নরকে যাবেন সেটা নির্ধারিত হয়।”

সব্যসাচী এইবার যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে, “আমার কর্মাঙ্ক কত?”

রমনীটি হাসেন। ফের বলেন, “সেটা আপনি ইতিমধ্যেই জানেন। কর্ম যজ্ঞের শুরুতেই আপনাকে আপনার কর্মাঙ্ক প্রদান করা হয়েছে। আপনার কর্মাঙ্ক...”

“নয় ছয় নয়। মানে নয়শো ঊনসত্তর!” সব্যসাচী বিস্মিত কণ্ঠেই কথাগুলো বলে।

“ঠিক তাই। এইবার দেখা যাক আপনার জন্য কোন কোন নরক অপেক্ষা করছে কর্ম যজ্ঞের এই পর্যায়ে!”

সামনের স্ক্রিনে এইবার মুহূর্তেই ওর ছবি ফুটে ওঠে। পরক্ষণেই ঠিক ওর ছবির নিচে একটা লম্বা বার দেখা যায়। নিচে একটা চক্র গোল গোল ঘুরছে। সেইবারের উপর দেখা যাচ্ছে একটা শতাংশ সূচক সংখ্যা। এক থেকে সেটা ক্রমশ একশোর দিকে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো বড় কম্পিউটারে যেন সব্যসাচীর বায়োডেটা লোড হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে।

এরপর কয়েক সেকেন্ড, পরক্ষণেই স্ক্রিনে শোনা গেল, একটা গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ,

“যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরূতেহর্জুন
জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা...

হে জীবাত্মা, নরকে নিজের পাপ স্খালনের এই সুযোগ কেবল শাস্তি ভোগের জন্য নয়, এ আসলে প্রকৃত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া। যে জ্ঞান জীবাত্মার অন্ধত্বকে বিনাশ করে তার মধ্যে পরমাত্মার জ্যোতিকে প্রকাশিত করে। প্রবল রূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে গ্রাস করে ভস্মীভূত করে, এই নরকে অর্জিত জ্ঞানাগ্নি তেমনই আপনার সমস্ত জড় কর্ম ফলকে দগ্ধ করবে।”

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। আবারও সেই পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠল,

“এই নরকে অর্জিত দিব্য জ্ঞান আপনাকে পরাশান্তি প্রদান করুক এই কামনা করি। এক্ষণে আপনার কর্ম ফল অনুযায়ী নির্ধারিত নরকগুলো জানানো হচ্ছে।”

এইবার মুহূর্তের মধ্যেই স্ক্রিনের মধ্যে অনেকগুলি তাস ভেসে উঠতে দেখা গেল। সব্যসাচী যদি খুব ভুল না হয় তাহলে আঠাশটা তাস স্ক্রিনের মধ্যে থরে থরে সাজানো। এইবার আচমকাই অনেকগুলি তাসে আগুন লেগে গেল। সেগুলো পুড়ে ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যেতে লাগল। একসময় স্ক্রিনের মধ্যে রয়ে গেল কেবল পাঁচটা তাস।

এইবার একে একে প্রত্যেকটা তাস উল্টে গেল স্ক্রিনের মধ্যেই। আর তাদের নিচে ফুটে উঠতে লাগল একেকটা নাম।

সেই রমনী এইবার আগের মতোই রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "জীবাত্মা নয় ছয় নয়, আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে পাঁচটি নরক। এগুলি হল যথাক্রমে দন্ডশুক, সারমেয়াদন, বৈতরণী, অন্ধকূপ ও রৌরব! এই নরক গুলিতে দণ্ড ভোগের সময় আপনি সুযোগ পাবেন আপনার কর্মাঙ্ক বাড়ানোর। একবার তা দুই হাজার হলে আপনার দণ্ড ভোগ শেষ হবে, এবং আপনি কর্ম যজ্ঞের তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবেন। কিভাবে আপনি নিজের কর্মাঙ্ক বৃদ্ধি করবেন তা নির্দিষ্ট নরকেই আপনাকে জানানো হবে। আপনার প্রথম গন্তব্য নরক দণ্ডশুক!"

পঞ্চম অধ্যায়

॥ কর্ম সন্ন্যাস যোগ ॥

"আআআআআ!" চারিদিকে প্রচন্ড চিৎকারে কানে তালা লেগে যাচ্ছে সব্যসাচীর। এ কোথায় আনা হয়েছে ওকে? এই কী তবে সেই ভয়ঙ্কর নরক যার কথা বেঁচে থাকতে এতবার শুনেছে ও। এই কি তবে সেই জায়গা যেখানে মানুষ অসীম যন্ত্রনা ভোগ করে তার কর্মফল ভোগ করার সময়?

একটা বড় সড় খাঁচার ভিতরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে সব্যসাচী। তার পরনে সামান্য বস্ত্রটুকু পর্যন্ত নেই। তার দুই পাশে সারি সারি এমন কত যে খাঁচা কত যে অনন্তদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা মনুষ্যবোধের অতীত। সামনে পিছনে এমন অসংখ্য খাঁচা। তার ভিতরে অসংখ্য মানুষ। আর মানুষের সঙ্গে সাপ!

হ্যাঁ, বিষাক্ত সব সাপ। প্রতি মুহূর্তে সেই বিষাক্ত সাপেরা ছোবল মারছে বন্দীদের শরীরে, আর তাদের তীব্র বিষক্রিয়ায় ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে তারা।

চারিদিকের এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সব্যসাচীর রীতিমত সারা শরীর শিউরে উঠছে। কিভাবে এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা সহ্য করবে সে? কিভাবে...

"জীবাত্মা নয় ছয় নয়, দণ্ড শুক নরকে আপনার দণ্ড ভোগ শুরু হচ্ছে এই মুহূর্তে। মনুষ্য জন্মে কোনো জীবাত্মা সর্পের ন্যায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতি সাধন করলে সেই পাপের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয় এই দণ্ডশুক নরকে। এখানে বিষাক্ত সর্পেরা প্রতি মুহূর্তে আপনার ভ্রম শরীরে দংশন করবে। তাদের বিষের জ্বালা আপনি ভোগ করবেন।"

খাঁচার ভিতরেই একটা পুরুষ কণ্ঠ গম্ভীর স্বরে কথাগুলো ঘোষনা করল। পরের মুহূর্তে আবারও শোনা গেল তার আওয়াজ, "এক্ষেত্রে প্রতি একশোটি সর্প দংশনে আপনার এক কর্মাঙ্ক বৃদ্ধি হবে। তবে জীবদ্দশায় রাগের মাথায় করে থাকা কোনো পাপ যদি আপনি স্বীকার করেন এবং তার জন্য প্রকৃত অনুশোচনা বোধ করেন তাহলে তার উপর ভিত্তি করে আপনার কর্মাঙ্ক দ্রুত বৃদ্ধি হতে পারে। আপনার কর্মাঙ্ক বারোশো হলে এখানকার দণ্ড ভোগ আপনার শেষ হবে।"

কথাগুলো যেমন আচমকাই ঘোষনা শুরু হয়েছিল, তেমনই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত সব্যসাচী শুধু বোকার মত দাড়িয়ে রইল এটা বোঝার জন্য কী হতে চলেছে তার সঙ্গে। পরক্ষণেই ও উপলব্ধি করল খাঁচার ভিতর কোথা থেকে যেন দুটো নালা খুলে গিয়েছে। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শয়ে শয়ে বিষাক্ত সাপ!

দেখতে দেখতেই সেই খাঁচার ভেতরকার বাতাস অচিরেই ভরে উঠতে লাগল বিষাক্ত ফনিনীদের হিসহিসে শব্দে। সব্যসাচী অনুভব করল ওরা আস্তে আস্তে ওকে পেঁচিয়ে ধরছে। ক্রমশ পা, পা বেয়ে কোমর, কোমর থেকে পেট, বুক হয়ে গলা... ওদের শীতল নরম শরীর নিয়ে ওরা ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওর শরীরের উপর। তারপর...

"আআ!" আচমকাই একটা সাপের প্রচন্ড দংশনে চিৎকার করে উঠল সব্যসাচী। প্রথমে একটা তারপর দুটো, তারপর শয়ে শয়ে সাপ যেন একসঙ্গে ওর গায়ে ছোবল বসাতে লাগল। তাদের ভয়ঙ্কর বিষে ওর সারা শরীর যেন

জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। মাথা কেমন যেন ধরে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শরীর ক্রমশ যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

"আমি পাপ করেছি।" আচমকাই এক বৃদ্ধের হাহাকারে পাশের খাচায় ফিরে তাকাল সব্যসাচী। বৃদ্ধর সারা শরীর সর্প স্তূপের তলায় চাপা পড়েছে। কেবল মাথাটুকু কোনো মতে বাইরে বেরিয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে তিনি চিৎকার করছেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ পাপ করেছি! আমি মহাপাতকের কাজ করেছি। রাগের মাথায় নিজের মা বাপকে আমি চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটাতাম। হে ঈশ্বর, এই পাপের জন্য আমায় ক্ষমা করো!"

"আমি রাগের মাথায় একটা লোককে এমন মেরেছিলাম সে সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছিল! হে ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দাও।"

"আমি রেগে গিয়ে আমার ছেলেকে এমন বকেছিলাম যে ও পরের দিনই ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। হে ভগবান আমার পাপ ক্ষমা করো।"

সব্যসাচী শুনতে পায় চারিদিক থেকে ভেসে আসছে হাজারও চিৎকার। হাজারও অনুশোচনা। হাজারও পাপের বর্ণনা। আর তারই সঙ্গে প্রাণান্তকর চিৎকার। বলাই বাহুল্য এই প্রত্যেকটা স্বীকারোক্তির সঙ্গে এদের কর্মাঙ্ক যে ক্রমশ বাড়ছে তা সব্যসাচী বিলক্ষণ খেয়াল করেছে।

কিন্তু ও কী পাপ করেছিল রাগের মাথায়? এমনিতে তো ও সেরকম রাগী ছিল না কখনও। বরং আজন্মকাল শান্ত শিষ্ট ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল সকলের কাছে। সেই সব্যসাচী কিনা ক্রোধের জন্য দণ্ড পাচ্ছে। রাগ করে কী এমন খারাপ কাজ করেছে ও?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আচমকাই চোখের সামনে ওর দৃশ্যটা ভেসে উঠল। এক মাঠ লোক। তাদের সামনেই মাঠের মাঝখানে একটা ছেলের বুকের উপর বসে পাগলের মত তাকে ঘুষি মারছে সব্যসাচী। ছেলেটার মুখ ফেটে গেছে। চোখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তাও সব্যসাচী থামছে না। সারা মাঠের লোক ছুটে এসেছে। কিন্তু তাও ও পাগলের মত মেরেই চলেছে।

"স্বীকার করো, স্বীকার করো। যত তাড়াতাড়ি পারো অনুশোচনা করো। নয়ত ওরা তোমায় গিলে খাবে!"

সব্যসাচী ডান দিকে ফিরে তাকায়। সেখানে শীর্ণকায় রোগাটে একটা লোক দাঁড়িয়ে। তার হাড় পাঁজরায় অল্প একটু মাংস আর চামড়া কোনক্রমে যেন লাগানো আছে। সেই কঙ্কাল সার শরীরেই সাপেরা ছোবল মারছে। সব্যসাচী কিছু বলতে যাবে তার আগেই লোকটা বলে উঠল,

"যত তাড়াতাড়ি তুমি নিজের ভুল স্বীকার করবে তত তাড়াতাড়ি মুক্তি। তাই স্বীকার করো। নিজের ভুল স্বীকার করো!"

লোকটাকে দেখে একরকম অবাকই হয়ে গেল সব্যসাচী। সাপেরা ওকে কামড়াচ্ছে। তবু ওর মুখে যেন কোনো যন্ত্রনার ছাপ নেই। আছে এক অদ্ভুত নিস্পৃহ ভাব।

"হ্যাঁ আমি পাপ করেছি। সেইদিন রবিনকে ওইভাবে মারাটা আমার উচিৎ হয়নি!" প্রচন্ড সর্প দংশনের মধ্যেই এইবার বলে ওঠে সব্যসাচী, "আসলে ওকে আমি ওভাবে মারতাম না। কিন্তু ওই ম্যাচে ও চিটিং করেছিল। ওর বাবা বিত্তবান মানুষ। শুধুমাত্র আমাকে টুর্নামেন্টে খেলতে দেবে না বলে ও আম্পায়ারকে টাকা খাইয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। ও জানত ওই ম্যাচটা আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ন ছিল সেদিন। ওইদিন ওই আম্পায়ার যদি ইচ্ছে করে আমায় আউট না দিত, তাহলে হয়ত আমার জীবনটা অন্য রকম হত।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব্যসাচী, "রবিনের জন্য আমি প্রথম দিন থেকেই একটা বড় থ্রেট ছিলাম। এমন একটা পথের কাঁটা যাকে ও যত শীঘ্র সম্ভব উপরে ফেলতে চেয়েছিল। ও জানত শেষ কম্পিটিশনটা ওর আর আমার মধ্যেই হবে। ও চায়নি আমি টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগটা পাই। তাই তার আগেই... আমি পরে একদিন ওর বাবার সাথে আম্পায়ারের কথোপকথন শুনে ফেলি। নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ওই সময় ও আরেকটা ম্যাচ খেলছিল। আমি রাগের মাথায় ফিল্ডে ঢুকে..."

একটা সাপ এইবার ঘাড়ের কাছে সজোরে কামড় বসাল সব্যসাচীর। কিন্তু নিজের কৃত কর্মের জন্য এই মুহূর্তে ও এতখানি অনুশোচনাবোধ করছিল যে সেই বিষের জ্বালাও যেন ও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়েছে ও। ওর দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু ধারা।

"আমার ওইভাবে মারা ওকে উচিৎ হয়নি। আমার উচিৎ ছিল ঠান্ডা মাথায় কাজ করা। ওইদিন ওকে এমনভাবে মেরেছিলাম যে ওর একটা চোখ চিরজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। ও কোনোদিন আর খেলতে পারেনি। আমিও চিরকালের জন্য ব্যান হয়ে যাই ক্রিকেটের মাঠ থেকে... হ্যাঁ, আমি নিজে... আমি নিজেই নিজের নিয়তির জন্য দায়ী!"

কাঁদতে কাঁদতেই চিৎকার করে ওঠে সব্যসাচী। একের পর এক সাপ এসে কামড় বসাতে থাকে ওর শরীরে। ও তারমধ্যেই শুধু দেখে উপরের স্ক্রিনে লেখা ওর কর্মাঙ্ক নিজে থেকেই বাড়ছে। নয়শো ঊনষাট থেকে বেড়ে এখন তা হয়েছে এক হাজার পঁচাশি!

এইবার যেন বুকের ভেতরে চেপে রাখা একটা বাঁধ ভেঙে যায় সব্যসাচীর। ঠিক পাগলের একের পর এক রাগের মাথায় করা নিজের ছোট থেকে ছোট ভুলের কথা উল্লেখ করতে থাকে সে। শুধু এই আশায় যে কর্মাঙ্ক বুঝি বাড়বে!

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়েই স্ক্রিনের থাকা সংখ্যা গুলো খুব একটা দ্রুত পরিবর্তিত হয় না! হাজারও চেষ্টার পর সব্যসাচী দেখে এখনও ওর কর্মাঙ্ক মাত্র এক হাজার একশ দুই হয়েছে।

এবার কী? আর তো কিছু মনে আসছে না সব্যসাচীর। ছোটবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা সে রাগের মাথায় করেছে সবই সে বলে দিয়েছে তাও তো কর্মাঙ্ক বাড়ছে না। তাহলে? এইবার কী করবে ও? এবার কী এই সর্প দংশন ভোগ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই ওর?

আচমকাই পাশের খাচার সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ চিৎকার করে ওঠেন, "ওই যে সাপগুলো দেখছিস, ওগুলো সব আমাদের কর্ম রে। আমাদের ঘিরে ধরে প্রতি মুহূর্তে দংশন করছে। এত সহজে কী আর ওর থেকে মুক্তি আছে? নির্মোহ ভাবে, তার প্রতি মন রেখে সন্ন্যাসীর মতন কর্ম না করলে সেই কর্ম পাশ যে আমাদের এমন ভাবে দংশন করবে রে। ওর থেকে মুক্তি পাওয়া যে এত সহজ নয় রে। এত সহজ নয়!"

পাশের লোকটা এইবার খিলখিল করে হাসছে। এ কি উন্মাদ? এর কি কোন জ্বালা যন্ত্রনার বোধ নেই? কে এ!

সব্যসাচী কিছু বলার আগেই লোকটা ঠিক আবারও খিলখিল করে হেসে ওঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সব্যসাচীর একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়। এই নরক, এই সাপ, এই সর্প দংশন এসব কিছুই তো বাস্তবের মনুষ্য জীবন থেকে আলাদা কিছু নয়! বেচে থাকতেও তো সে এমন ভাবেই নিজের কর্মের জন্য ভুগেছে, যন্ত্রনা ভোগ করেছে। শুধু সে কেন প্রত্যেকটা মানুষই তো তাই করে!

তাহলে এই লোকটা এমন ভয়াবহ যন্ত্রনার মধ্যেও এমন হাসছে কী করে? আচ্ছা, বাস্তব মনুষ্য জীবনেও হাজার সর্পরূপ কর্মের দংশনের মধ্যেও কী মানুষের পক্ষে এমনভাবেই হাসা সম্ভব!

এই লোকটা কার কথা বলছে? কার চিন্তা এই হাজারও সর্প দংশনের মধ্যেও ওর মুখে একে দিচ্ছে প্রশান্তির হাসি? নিজের খাচার মধ্যে হাজারও ফনিনীর দংশনের মাঝেই হঠাৎ সব্যসাচীর মনে পড়ে গেল ওই মেয়েটার বলা অদ্ভুত কথাগুলো।

"তাকে জানতে হবে। তাকে জানলে তবেই এই জন্ম মৃত্যুর চক্র ভেদ করা যায়! তাকে জানলে প্রবল আনন্দেও নিরুদ্বেগ থাকে যায়, আবার হাজার যন্ত্রণাতেও মুখে হাসি ফোটে।"

এক হাজার একশো দুই! এখনও স্ক্রীনে কর্মাঙ্কের সংখ্যা একই আছে। প্রতি মুহূর্তে সব্যসাচীকে দংশন করছে শত শত বিষধর সাপ। তাদের বিষের জ্বালায় প্রাণপণ চিৎকার করতে করতেও যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে ও। তবুও... তবুও কেন ওর কর্মাঙ্ক বাড়ছে না?

অথচ সব্যসাচী তো ওর রাগের মাথায় করা সমস্ত অন্যায় স্বীকার করে নিয়েছে। তাহলে? এখনও কি এমন কিছু বাকি থেকে গেছে যা ও স্বীকার করেনি? যে কারণে ওর এই ভয়াবহ নরকে দণ্ড ভোগ শেষ হয়নি?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আচমকাই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা। ওর সামনে দাড়িয়ে আছে রিনা। অশ্রু সজল চোখ। মুখে জমাট বাঁধা চূড়ান্ত অবিশ্বাস আর আঘাতের চিহ্ন। রিনা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সব্যসাচী কী বলছে। আর্দ্র কণ্ঠেই ও বলে উঠল,

"এসব তুই কী বলছিস সব্য? তুই জানিস না অনীকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?"

“হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানি। আমার সামনে সত্যিটা দেখাতে পারিস না তাই নিজেদের ভাই বোন বলে পরিচয় দিস। কিন্তু তোরা ভাই বোন যে সুযোগ পেলে কী কী করিস আমার কি জানতে বাকি নেই। কেন ও তোকে দামী দামী উপহার কিনে দেয়! কেন চকলেট, বই, গলার হার...”

সব্যসাচী কথা শেষ করার আগেই সজোরে একটা চড় এসে পড়ে ওর গালে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠেই রিনা বলে ওঠে,

“চুপ কর। আর বলিস না। প্লিজ আর নিজেকে ছোট করিস না। আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে তোর সঙ্গে আট আটটা বছর আমি একসঙ্গে কাটিয়েছি... আর এখনও তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস না। শেষে কিনা অনীকের সাথে...”

“বাঃ এখন অনীকের নামে একটা কথাও শুনতে চাইছিস না। বাঃ! আমার গায়ে হাতও তুললি তুই? সে তো তুলবিই। আমি তো একটা গুড ফর নাথিং। এখনও বেকার। চাকরি নেই। বাবার টাকা নেই। তোর ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ডের থেকে অনেক অনেক নিচুতে না আমি...”

“সেটাই যদি ভাবতাম তাহলে এতগুলো দিন তোর সঙ্গে কাটাতাম না। সেটাই যদি ভাবতাম তাহলে একের পর এক বিয়ের সম্পর্ক ক্যানসেল করে বাবার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করেও তোর পাশে থাকতাম না। আর অনীক... তুই কি আজ নতুন চিনছিস ওকে? অনীক যে মেয়েদের প্রতি কোনোদিন ইন্টারেস্টেড ছিল না, ডিডন্ট ইউ নো ইট?”

“চুপ কর তো। মেয়েদের কাছাকাছি আসার জন্য ওসব ঢপের কথা ছেলেরা অনেক বলে। প্রথমে এই বলে তোর ক্লোজ হবে, তারপর একটু একটু করে তোর মনটা বিষিয়ে দেবে আর তারপর যেই আমি তোর জীবন থেকে সরে যাব তখন ভাই থেকে প্রেমিক হয়ে যাবে...”

“সব্য! প্লিজ চুপ কর তুই। প্লিজ। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই অকারণে ঝগড়া আমি আর নিতে পারছি না। প্লিজ...”

“তা নিতে পারবি কেন? নতুন মনের মানুষ হয়েছে তো তোর। দামী দামী গিফ্ট, দামী চকলেট। বেকার বয়ফ্রেন্ডের কথা তো গায়ে লাগবেই এখন। আর চুপ থাকতে বলছিস... কেন চুপ করব? আজ আমি জীবনে দাঁড়াতে পারিনি,

আমার একটা ঠিকঠাক উপার্জন নেই বলে তুই যা পারবি তাই করবি। আমার চোখের সামনে আরেকটা ছেলের সঙ্গে ঘুরবি ফিরবি আমি কিছু বলব না? আজ একসাথে ঘুরছিস কাল একসাথে শুবি...”

আবারও একটা সজোরে চড় এসে পড়ে সব্যসাচীর গালে। এইবার যেন একমুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে ও। রাগের মাথায় কথা বলতে বলতে কখন যে নিজের গন্ডিটুকু ও পেরিয়ে গেছে বুঝতেও পারেনি। অপর প্রান্তের দাড়ানো মানুষটা যে ওর বিষাক্ত কথার দংশনে কী তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করছে সেই খেয়াল টুকুও ওর নেই।

রিনার চোখে চোখ রেখেই এইবার শিহরিত হয়ে ওঠে সব্যসাচী! সেই চোখে আর আঘাত নেই, যন্ত্রনা নেই, বেদনা নেই। সেই চোখে অদ্ভুত শূন্যতা। অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাব। আর একটা কথাও বলে না রিনা। সেই মুহূর্তে পিছনে ফিরে দৌড় দেয় রাস্তায়। সব্যসাচী শুধু পাথরের মত দাড়িয়ে থাকে। আচমকাই বৃষ্টি নামে... সেই প্রবল বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয় সব্যসাচীকে...

“হ্যাঁ আমি ভুল করেছি। যেই মানুষটা নিজের সবটুকু দিয়ে আমায় ভালোবেসেছিল আমি তাকেও রাগের মাথায় ক্ষত বিক্ষত করতে ছাড়িনি!”

হাজারও সর্প দংশনের মধ্যেই সব্যসাচী যেন এখন পাথর হয়ে গেছে। চারিপাশের কোলাহল, চিৎকার, এই তীব্র শারীরিক যন্ত্রনা কোনো কিছুর প্রতিই ওর ভ্রুক্ষেপ নেই আর। ওর চোখের সামনে ভাসছে রিনার সেই শূন্যতা মাখা চোখ দুটো শুধু।

কাউকে ভালোবাসি মানেই কি তাকে আমি যখন খুশি যেভাবে খুশি আঘাত করতে পারি? সব মানুষেরই তো সহন শক্তির একটা শেষ সীমানা থাকে। কেবল আঘাত করতে করতে আমরা এটা ভুলে যাই যে আমার উল্টো পিঠে দাড়িয়ে থাকা মানুষটা আঘাত পেতে পেতে একসময় পাথর হয়ে গেছে। আর ভালোবাসার মানুষ পাথর হয়ে গেলে সে আর কখনও ফেরে না। সম্পর্কে শুধু পড়ে থাকে অনন্ত শূন্যতা!

“হ্যাঁ আমি পাপ করেছি। রাগ... নিজের অক্ষমতার জন্য রাগ, নিজের অযোগ্যতার জন্য রাগ, নিজের ব্যর্থতার জন্য রাগ সবটা আমি ঢেলে দিয়েছি রিনার উপর। যে আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি তাকেই সবচেয়ে বেশি

আঘাত দিয়েছি আমি। রাগের মাথায় ওকে ক্ষতবিক্ষত করতেও দু'বার ভাবিনি! হে ঈশ্বর এই নরক থেকে আমার মুক্তি পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। আমার মত পাপীর এই নরকেই পচে মরা উচিৎ...আমার মত পাপীর এটাই যোগ্য শাস্তি..."

এইবার প্রচন্ড কান্নায় ভেঙে পড়ে সব্যসাচী। তার শরীরটা আস্তে আস্তে ডুবে যেতে থাকে শয়ে শয়ে সাপের স্তূপের ভেতর। সাপ নাকি কর্ম? হাজার কর্মের পাশে এইভাবেই তো ডুবে যায় মানুষ। উহু মানুষ নয়, জীবাত্মা। তারপর জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু...মুক্তি নেই!

"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণা

গচ্ছন্ত্যপুনরায়বৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ"

আচমকাই আবারও একটি পুরুষ কণ্ঠের শব্দে চমকে উঠল সব্যসাচী।

"দেহ ধারণের ফলে দেহগত নানান প্রবৃত্তির শিকার জীবাত্মা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হয়। অথচ তাকে জানলেই প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই হে জীবাত্মা, তোমার বুদ্ধি তার প্রতি স্থির করো, মন তার চিন্তায় একাগ্র করো, নিষ্ঠা তার প্রতি দৃঢ় করো, এবং তাকেই তোমার একমাত্র আশ্রয় রূপে গ্রহণ করো। তবেই তোমার সমস্ত অজ্ঞানতার কলুষ জ্ঞানের দ্বারা বিধৌত হবে। এবং তুমি এই নরক থেকে মুক্তি মার্গ প্রাপ্ত হবে।"

পুরুষ কণ্ঠটি চুপ করে যায় এবার। পরক্ষণেই ফের তার শব্দে গমগম করে ওঠে চতুর্দিক।

"জীবাত্মা নয় ছয় নয়, আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, আপনার কর্মাঙ্ক বারোশ সম্পূর্ণ হয়েছে। নরক দণ্ডশুকে আপনার সময় সমাপ্ত হয়েছে। আপনার পরবর্তী গন্তব্য নরক সারমেয়াদন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ধ্যান যোগ ॥

এক অদ্ভুত স্থানে এই মুহূর্তে দাড়িয়ে আছে সব্যসাচী। একে নরক বলবে নাকি স্বর্গ তা ওর জানা নেই। এ এক অদ্ভুত নগরী। চারিদিকে সুসজ্জিত বিশাল বিশাল ইমারত। সেই সমস্ত ইমারতের সামনে একটি করে কুকুরের প্রস্তর মূর্তি। পুরো নগর জুড়েই চতুর্দিকে ছড়ানো আছে এমন অসংখ্য কুকুরের প্রস্তর মূর্তি। সমগ্র নগরটাকেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে নানান বর্ণচ্ছটায়। চতুর্দিক সাজানো হয়েছে নানান বর্ণের ফুলে। তবে তার চাইতেও যা সুন্দর...

সব্যসাচীর সেদিকে তাকাতেই হৃদকম্পন যেন বেড়ে গেল। রমনী। অসম্ভব সুন্দরী সব রমণীরা দাড়িয়ে আছে একেকটি গৃহের সামনে। তাদের গায়ে সুগন্ধির প্রলেপ, চোখে মোহিনী দৃষ্টি, শরীরে সুতীব্র আকর্ষণ। চতুর্দিকে থেকে ভেসে আসছে কামনাতুর আহ্বান ধ্বনি।

অবশ্য শুধু নারী তো নয়, পুরুষরাও আছে। অর্ধনগ্ন শরীর, স্বল্পবাস। সুগঠিত পুরুষালি চেহারা। তাদের চোখে জ্বলন্ত কামভাব। তবে সেই কামাতুর দৃষ্টিতে নারীরা দগ্ধ হবেন না, বরং পতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেবেন সেই কামনাগ্নিতে।

শুধু কি তাই? চারিদিকে কত যে খাদ্য সুন্দরভাবে সাজানো তার ইয়েত্তা নেই। সব্যসাচী অবাক হয়ে দেখছে আর শুধু দেখছে। চারিদিকে অফুরন্ত লোভনীয় খাদ্যের সম্ভার। এত সুস্বাদু চিত্তাকর্ষক খাবার সে জীবদ্দশায় দেখেনি।

এ কী নরক? নাকি স্বর্গ? সব্যসাচী কী ভুল করে স্বর্গে চলে এসেছে? সব্যসাচী অবাক হয়ে চেয়ে দেখল তার সঙ্গেই আরও অনেকগুলি মানুষ পরপর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মনেই একই রকম বিস্ময়। প্রত্যেকের চোখেই একইরকম আকর্ষণ।

“নরক সারমেয়দনে আপনাদের সকল জীবাত্মাদের স্বাগত জানাই। মনুষ্য জন্মকালে জীবাত্মা সম্পূর্ণ জ্ঞানে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নানান রকম কুটিল কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই সব ক্রুর ও কুটিল কর্মের দণ্ড ভোগ করতে নরক সারমেয়াদনে তাদের আনা হয়।

এখান থেকে মুক্তির একটাই উপায়। এই নরক নগরীর সুবিশাল দ্বার অতিক্রম করা।”

অতিপরিচিত সেই পুরুষ কণ্ঠের ঘোষনায় সব্যসাচী সচকিত হয়েই সামনের দিকে তাকাল। অনতি দূরেই দেখা যাচ্ছে নগরীর সুউচ্চ সুবিশাল দ্বার। সেই দ্বার উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। এখান থেকে বেরোলেই এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে! এতই সহজ?

“তবে এক্ষেত্রে একটিই শর্ত। আপনাদের সকলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয়েছে। সেই সময় অব্দিই ওই দরজা উন্মুক্ত থাকবে। একবার সেই সময় অতিক্রান্ত হলে কেউ এই নরক থেকে আর বেরোতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাকে অনন্ত কাল এই নরকেই যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে!”

পুরুষ কণ্ঠের ঘোষনা শেষ হওয়া মাত্রই সব্যসাচীর পাশ থেকে একটা লোক চিৎকার করে উঠল, “যন্ত্রনা! কোথায় যন্ত্রনা। এ তো দেখছি সাক্ষাৎ স্বর্গ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

লোকটির কথায় এইবার অনেকেই হাসতে হাসতে সায় দিলেন। ঠিক তখনই আবারও সেই পুরুষ কণ্ঠের ঘোষনা শোনা গেল,

“উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ

হে জীবাত্মা, মনুষ্যের মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, দুর্দমনীয় ও অত্যন্ত বলমান। তাই মনুষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিৎ নয়। হে জীবাত্মা, নরক সারমেয়াদনে অবস্থান কালীন আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে অবস্থা বিশেষে আপনার মনই আপনার সবচাইতে বড় মিত্র আবার অবস্থা বিশেষে আপনার মনই আপনার সবচাইতে বড় শত্রু।”

কথাগুলো শেষ হওয়া মাত্র সকলেই যেন একে অপরের দিকে তাকাল একবার। কথাগুলো এখানে উপস্থিত কতজন ঠিকঠাক উপলব্ধি করল তা অবশ্য বোঝা গেল না।

“আপনাদের জন্য নির্ধারিত সময় শুরু হচ্ছে এখন!”

ঠিক এইবার নগরের একদম শেষ প্রান্তের কালো অন্ধকার স্ক্রিনে কতগুলো সংখ্যা ভেসে উঠল। সব্যসাচী দেখল সেখানে ফুটে উঠেছে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। ঠিক তিন ঘণ্টা তেত্রিশ মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড।

****

কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সব্যসাচী। চারিদিকে ও যা দেখছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই স্বর্গ রূপ নগরীতে মেতে উঠেছে রমনোল্লাসে। নারীরা পুরুষদের সহিত ও পুরুষরা নারীদের সহিত যে যেখানে যার সাথে সম্ভব নগ্ন রমণে লিপ্ত হয়েছে।

নগরীর বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে কামাতুর হর্ষ ধ্বনিতে। শুধু কি তাই! যে যেখানে যা পারছে খাবার খেতে শুরু করেছে। না দেখলে বিশ্বাস ঠিক হবে না। সামনে সাজানো এই অঢেল সুন্দর খাবারের মধ্যে অনেকেই যেন ডুবে গেছে। খাবার ছাড়া তারা যেন অন্য কিছু দেখতেও পাচ্ছে না।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় যে কেউ এখান থেকে বেরোনোর কথা ভাবছে না পর্যন্ত। সামনে উন্মুক্ত দরজা অথচ সকলেই ভোগ বাসনায় মত্ত!

আচমকাই এই মধ্য বয়সী পুরুষ কণ্ঠে চমকে উঠল সব্যসাচী।

“আরে ও ছোকরা দাঁড়িয়ে দেখছ কী হে। ভোগ করো ভোগ করো। ওসব জ্ঞানের কথা শুনে কোনো লাভ নেই বাপু। বেঁচে থাকতে আমি সবসময় বলতাম, জীবন তো একটাই। এই এক জীবনে ভোগ করবে না তো কবে ভোগ করবে বলো দেখি।”

লোকটা এইবার সামনে এসে দাঁড়াল সব্যসাচীর। বিশাল মেদবহুল শরীরে একছটাক কাপড়ও নেই তার। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরের এখানে সেখানে নখ ক্ষত, দন্ত ক্ষত। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে এক্ষুনি নারী রমন থেকে উঠে এসেছে। হে ঈশ্বর! এ কী সাধারণ লাজ লজ্জাও বিস্মৃত হয়েছে?

“আরে আমায় দেখে এত অবাক হওয়ার কী আছে হে! যৌনতা তো খুবই সাধারণ একটা শারীরিক চাহিদা। শরীরের খিদে পেলে শরীর খাবে না? ওসব সংযম হ্যান ত্যান জ্ঞানের বুলি আউরে কী লাভ! যতক্ষণ শরীর খানা আছে

ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও। এই জন্নতে আসার একবারই মাত্র সুযোগ পেয়েছ। তাই যত খুশি ভোগ করে নাও। ওই যে কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!”

লোকটা এবার পাগলের মতই ছুটে গেল সামনে রাখা খাবারগুলোর দিকে। সেখান থেকে দুখানা মুরগির ঠ্যাং তুলে পরম তৃপ্তিতে খেতে শুরু করল সে। কিন্তু সব্যসাচীর এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যেন গা গুলিয়ে উঠল।

কিন্তু মনের কোণে দানা বাঁধা সংশয়টাও যে কাটছে না! সত্যি তো! এতটা সময় হয়ে গেছে। কেউ তো এখান থেকে বেরোনোর কথা ভাবছে না। সকলেই ভোগ করে নিচ্ছে। নারী, খাদ্য, সূরা। যতখানি সম্ভব। তাহলে ও কেন বাদ যাবে? এই নরকে তো ও আর কোনোদিন আসতে পারবে না। হয়তো এটাই প্রথম ও শেষ বার। তাহলে একবারের জন্য ও এই অসীম ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করবে না?

আচমকাই এক রমনীর স্পর্শে এইবার সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে সব্যসাচীর। ও দেখে অত্যন্ত সুন্দরী এক রমনী ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে অতি সূক্ষ ও স্বল্প বাস। মুখে লাস্যময়ী হাসি। কোনো কথা না বলেই সব্যসাচীর শরীরে এইবার সে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে শুরু করে। ক্রমশ তার পোশাকের ভেতর দিয়ে, বক্ষে, নাভিতে, পিঠে। সব্যসাচীর শরীর যেন মুহূর্তের মধ্যে জেগে ওঠে।

সত্যিই তো! এই তো একবার মাত্র সুযোগ। এ সুযোগ হাত ছাড়া করার কোনো মানেই হয় না। মুহূর্তের মধ্যে সে চুম্বনে লিপ্ত হয় সেই রমনীর সাথে। চুম্বন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। নিজের পোশাক এইবার সে খুলে ফেলতেই যাবে ঠিক তখনই একটা পরিচিত কণ্ঠে চমকে ওঠে সব্যসাচী।

“ছাড়! ছাড় ওকে। ছাড় বলছি। রাক্ষুসী ছাড়!”

ওই মেয়েটা। যাকে সব্যসাচী লিফটে দেখেছিল। সেই ছোট চুল, মায়াময় হাসি। সেই মেয়েটা এই রমনীর চুল টেনে ধরেছে। পরক্ষণেই তাকে টেনে ধরে মাটিতে আছাড় মারল ও।

“এখান থেকে দুর হয়ে যা বলছি। নইলে কিন্তু ভালো হবে না।”

রমনীটি এইবার মেয়েটার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। অমন সুন্দর মুখে এমন ভয়ঙ্কর কুটিল ভাব যে ফুটতে পারে সব্যসাচী বিশ্বাসই করতে পারে না। পরক্ষণেই সব্যসাচীর দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর কোনো কথা না বলেই দ্রুত উঠে চলে যায় সেখান থেকে।

"এটা কী করলে তুমি?" সব্যসাচী যেন মুহূর্তের মধ্যে রেগে যায়।

"কী করলাম আমি? তুমি কী করছিলে? ভুলে গেলে কিভাবে এখানে এসে পৌঁছেছ? কত যন্ত্রনা সয়ে, কত কষ্ট করে! এখান থেকে না বেরিয়ে তুমি ওই রাক্ষুসীটার সঙ্গে..."

"কে রাক্ষসী? তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?"

মেয়েটি এইবার একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। তারপর বলে, "ও হ্যাঁ, তুমি তো সাধারণ জীবন যাপন করেছে। প্রারব্ধ না দেখলে ওদের স্বরূপ দেখা যায় না। তোমার চোখে তো ওদের সুন্দর লাগবেই। বাকিদের যেমন লাগছে।"

এইবার সব্যসাচী অবাক হয়। এক মুহূর্তের জন্য ওর সব মনে পড়ে যায়। এখানে আসার যন্ত্রনা। কষ্ট। ওর মায়ের আত্মত্যাগ। ভয়াবহ সর্প দংশন। সত্যিই তো এক মুহূর্তের জন্য ও সবটা ভুলে গেছিল। ওর মনে চলছিল কেবল...

"নরক সারমেয়াদন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নরক গুলোর মধ্যে একটা। কেন এই নরকে মানুষের অনন্ত কাল ধরে বন্দী থাকে তা এখন বুঝতে পারছি।"

মেয়েটির কথা ক্রমশ যেন এক অদ্ভুত কৌতূহল জাগাচ্ছে সব্যসাচীর মনে।

"তোমার কথার কোনো মানেই আমি বুঝতে পারছি না। প্লিজ একটু ব্যাখ্যা করবে? তুমি লিফটেও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলে। তুমি নাকি যোগী। এই যোগী কারা?"

মেয়েটি এইবার হাসে। হাসলে মেয়েটাকে যেন অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। সে বলে, "বলতে পারি। একটাই শর্ত। আমার সঙ্গে দরজার দিকে তোমায় যেতে হবে। চারপাশের এই হাজারও প্রলোভন এড়িয়ে। এমনিতে আমি কাউকে সাহায্য করি না। কিন্তু তুমি যেহেতু প্রথম পর্যায়ে আমায় সাহায্য করেছিলে সেজন্য এটা শুধুই উপকার ফিরিয়ে দেওয়া হিসেবে ধরতে পারো।"

সব্যসাচী এক মুহূর্তের জন্য যেন গভীর চিন্তায় পড়ে যায়। এই মেয়েটার কথা শোনা কী ঠিক হবে? এখানের এত সুখ, এত ভোগের বস্তু, এত মদ, এত

নারী এত খাদ্য ছেড়ে দরজার দিকে যাওয়া কি ঠিক হবে! ও ভুল করছে না তো। একবার মাত্র পাওয়া সুযোগ ও হেলায় হারাচ্ছে না তো।

মেয়েটা অদ্ভুতভাবে ওর মনের কথাগুলো যেন শুনতে পায়। তারপর নিজে থেকেই বলে, "চারিদিকে তুমি যা দেখছ এর কোনোকিছুই সত্যি নয়। সবই ভ্রম মাত্র। এগুলো অবিদ্যা আর অজ্ঞানের রূপ। এসবের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমার এই শরীরটাও যে সত্যি না এটা ভুলে গেলে। কেবল নরকের যন্ত্রনা ভোগ করার জন্য এই শরীর তোমায় দেওয়া হয়েছে। মনে নেই!"

সব্যসাচীর এইবার সব মনে পড়ে যায়। সত্যিই তো! এও তো ভ্রম শরীর। এও তো সত্যি না। ও তো মরে গেছে। ও তো নরকে। তাহলেও ও কিভাবে এতটা আত্ম বিস্মৃত হচ্ছে?

"এই শরীরের প্রবৃত্তিগুলোর দ্বারা মনকে মোহগ্রস্ত হতে দিও না। আমার সঙ্গে চলো। আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে! সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

সব্যসাচী সামনের স্ক্রিনে বড় ঘড়িটার দিকে তাকায়। কী অদ্ভুত সেখানে দেখায় আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি আছে। কিন্তু একটু আগেই তো ওই ঘড়িতে অবশিষ্ট সময় আড়াই ঘন্টা ঘণ্টা দেখাচ্ছিল! এ কী করে সম্ভব!

"হ্যাঁ, ঘড়ি তাড়াতাড়ি চলছে। এই নরকে মানুষ যত ভোগে লিপ্ত হয়, তত ওই ঘড়ি তাড়াতাড়ি চলে। কিন্তু ভোগ বাসনায় লিপ্ত মানুষের সেদিকে দেখবার সময় থাকে না। তার যে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাকে যে মুক্তির দরজা খুঁজতে হবে তার সেদিকে ভ্রুক্ষেপই থাকে না। তাই এই নরক থেকে কোনোদিন সে বেরোতেও পারে না।"

মেয়েটির বলা কথাগুলো শুনে এইবার যেন এক অদ্ভুত শিহরন খেলে যায় সব্যসাচীর শরীরে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠেই ও শুধু বলে, "আমি যাব তোমার সঙ্গে। চলো।"

****

"তোমার নাম কী?" দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতেই এইবার সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে মেয়েটাকে। মেয়েটার বলা কথাগুলো এক বর্ণ মিথ্যে না। সত্যিই ঘড়ির

সময় দ্রুত কমছে। এখন সময় মাত্র কুড়ি মিনিট অবশিষ্ট। কিন্তু কী অদ্ভুত কারুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই!

"জীবাত্মার কোনো নাম হয় না। ইনফ্যাক্ট নাম, ধাম লিঙ্গ, পরিচয় এসব কিছুই হয় না জীবাত্মা মনুষ্য যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সাময়িক ভাবে তার নাম ধাম হয়। তবে সেসব মৃত্যুর আগে পর্যন্তই ভ্যালিড। তারপরে না।"

"মৃত্যুর আগেই তোমার কী নাম ছিল?"

"কোন মৃত্যুর আগে?" মেয়েটা হাসে এবার। তারপর বলে, "শেষ বার আমার নাম ছিল যোগমায়া। তার আগের বার পার্বতী। তার আগেরবার আদ্যা। তার আগের বার কমলা..."

"ব্যাস ব্যাস। বুঝে গেছি।" সব্যসাচী হাসে। তারপর বলে, "তোমার সব কী করে মনে আছে? কারুর তো এখানে কিছুই মনে নেই।"

মেয়েটি আবারও রহস্যময় হাসি হাসে। "ওই যে বললাম আমি যোগী। যোগের মাধ্যমে তাকে জানা সম্ভব। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব। আর একবার তার সঙ্গে যুক্ত হলে জন্ম জন্মান্তর সমস্ত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"

"এই যোগ মানে কী? এই যোগের অর্থ কী? কিভাবে কেউ যোগী হবে!"

মেয়েটি এইবার বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে ওঠে,

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের জ্ঞান ও নিজের উপলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ও জিতেন্দ্রিয়। যে পাথর, মাটি আর সোনাকে একই চোখে দেখে। তিনিই যোগারুঢ়। তিনিই যোগী।"

সব্যসাচী শুধু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। ওর কথাগুলো যেন মাথার উপর দিয়ে সব্যসাচীর। ওর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়েই মেয়েটা এইবার বলে, "জীবাত্মার একমাত্র কর্তব্য কর্ম কী জানো? পরমাত্মাকে জানার চেষ্টা করা। আর কিছু না। সহজে বললে তার সঙ্গে যে বন্ধন স্থাপনের প্রক্রিয়া সেটাই যোগ। এবার তাড়াতাড়ি দৌড়াও। সময় আর নেই!"

সত্যিই ঘড়ির সময় এইবার দ্রুত কমছে। এইটুকু সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র পাঁচ মিনিটে। আর দেরি করে না সব্যসাচী। ওই তো সামনে দরজা। ওর

সঙ্গে মেয়েটি এবার পাগলের মত দৌড়াচ্ছে। তার সঙ্গে ও নিজেও দৌড় লাগায়।

মেয়েটা চিৎকার করে ওঠে "যত এখানে ভোগ বাড়বে তত এই দরজা দূরে যেতে থাকবে আর সময় তাড়াতাড়ি কাটতে থাকবে। তাই জোরে দৌড়াও। যতটা সম্ভব ততটাই জোরে।"

সব্যসাচী এইবার পাগলের মত দৌড়াতে থাকে। সত্যিই ও যত দৌড়াচ্ছে দরজাটা ক্রমশ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে যে ওই দরজায় পৌঁছাতেই হবে!

একসময় হাঁফাতে হাঁফাতেই দরজার সামনে এসে পৌঁছায় ও। তারপর ঠিক কয়েক মুহূর্ত। দরজা পেরিয়ে এই পাড়ে এসে মাটির উপর বসে পড়ে ও আর ওই মেয়েটা। প্রচন্ড শ্বাস কষ্টে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে ওর। কিন্তু ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ে সেই বিশাল দরজার ওই প্রান্তে!

সঙ্গে সঙ্গেই সারা শরীর আতঙ্কে ঘেন্নায় কেঁপে ওঠে ওর। হে ঈশ্বর! ও কী ঠিক দেখছে। এ কোন অন্ধকার নগরী। কোথায় আলো? কোথায় ফুল? কোথায় সুন্দরী রমনী খাদ্য সূরা? চারিদিকে বিশ্রী উগ্র গন্ধ গন্ধ। চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ। মানুষেরা যেগুলো অমৃত ভেবে খাচ্ছে সেই গুলো আর কিছুই না পচা গলা মৃতদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ!

আর যাদের সঙ্গে সঙ্গম করছে... তাদের দেখেই এইবার প্রচন্ড বমি পায় সব্যসাচীর। কোথায় সুন্দর রমনী ও পুরুষ! এরা তো ভয়ঙ্কর নরকের জীব। এদের গায়ে বিশ্রী চর্ম রোগ। এরা বিকট দর্শন, ভয়াল রূপ। আর একটু হলে এর সঙ্গেই সব্যসাচী রমনে লিপ্ত হতে যাচ্ছিল...

"কাম, ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয় এ সকলই জড় শরীরের ধর্ম সব্যসাচী। তাই আমাদের এই সকল প্রবৃত্তি গুলোকে সবসময় নিয়ন্ত্রনে রাখা উচিত। নইলে তো দেখতেই পাচ্ছ কী ফল হয়!"

মেয়েটি এইবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, "তুমি জানতে চাইছিলে না কিভাবে যোগী হওয়া যায়? এই শরীরের প্রবৃত্তিগুলোকে অভ্যাসের সংযমে রাখলেই একমাত্র সেটা সম্ভব। কেউ জ্ঞানের মাধ্যমে তার কাছে

পৌঁছায়, কেউ কর্মের মাধ্যমে। তবে এই নরকে তার কাছে পৌঁছানোর শ্রেষ্ঠ উপায় একটাই। ভক্তি।”

সব্যসাচী এইবার মুখ তুলে তাকায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটির মুখে যেন অসীম প্রজ্ঞা দীপ্তি।

“এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি সব্যসাচী। তার আশ্রয় নাও। নিজের সবকিছু তার প্রতি উৎসর্গ করো। এই ভয়ঙ্কর নরকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তুমি তার কাছে পৌঁছতে পারবে। বুঝলে?”

সব্যসাচী কিছু বলতে যাবে তার আগেই একটা বিকট সাইরেনের শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সেই পুরুষ কণ্ঠ আবার শোনা যায়।

“নরক সারমেয়াদনে আপনাদের জন্য নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হয়েছে। এখান থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন জীবাত্মা নয় ছয় নয়! পূর্বে বলা নিয়ম অনুযায়ীবাকিদের এই নরকেই অনন্ত কাল অতিক্রম করতে হবে।”

এইবার আচমকাই নগরীর ভেতরকার লোকেরা যেন চমকে ওঠে। এইবার সমস্ত ভোগ্য বস্তুর আসল রূপ গুলো চোখের সামনে উন্মোচিত হয় তাদের। পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে তারা। ছুটে আসতে চায় দরজার দিকে। কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

নগরীর সমস্ত সারমেয় প্রস্তর মূর্তিগুলি জেগে উঠতে থাকে। ক্রমশ প্রস্তর মূর্তির খোলস ত্যাগ করে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর দর্শন ক্ষুধার্ত সারমেয়র দল। এইবার তারা একের পর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে বাকি মানুষদের উপর। একেক কামড়ে তারা খুবলে তুলে নিচ্ছে মাংস, রক্ত, পেশী!

কিছুক্ষণ আগেও যে নগরীর বাতাস কম্পিত হচ্ছিল উল্লাস ধ্বনিতে এখন তাই ভরে ওঠে চিৎকারে, অভিসম্পাতে আর ভয়াবহ আর্ত চিৎকারে।

“সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে, নরক সারমেয়াদনে বন্দী জীবাত্মারা তাদের নির্ধারিত যন্ত্রনা ভোগের পর প্রত্যেকেই সারমেয়তে রূপান্তরিত হবেন। এবং প্রস্তর রূপে অসীম ক্ষুধার শিকার হবেন। প্রতিবার নতুন জীবাত্মারা এখানে বন্দী হলে তারা তাদের ভ্রম শরীর ভক্ষণের মাধ্যমে নিজ ক্ষুধা নিবারণের সুযোগ পাবেন।”

অবিশ্বাসের চোখে এইবার সব্যসাচী তার পাশে মেয়েটার দিকে তাকায়। কিন্তু কী অদ্ভুত! মেয়েটা তো নেই! কোথায় গেল ও। এই তো একটু আগেও এখানেই ছিল। তাহলে? আচমকাই এইবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন মাথায় আসে সব্যসাচীর। আচ্ছা, ও তো একবারও মেয়েটাকে নিজের নাম বলেনি। তাহলে মেয়েটা ওর নাম জানল কী করে?

সব্যসাচীর চিন্তার জাল ছিন্ন করে সেই যান্ত্রিক পুরুষ কণ্ঠ আবারও গমগম করে ওঠে। তবে এবার আর বন্দী জীবাত্মাদের জন্য নয়। বরং স্বয়ং সব্যসাচীর জন্য।

“জীবাত্মা নয় ছয় নয়। আপনার কর্মাঙ্ক বর্তমানে চোদ্দশো। নরক সারমেয়াদনে আপনার সময় সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনার পরবর্তী গন্তব্য নরক বৈতরণী!”

সপ্তম অধ্যায়

॥ বিজ্ঞান যোগ ॥

একটা ছোট্ট টিলার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সব্যসাচী। টিলার চারিদিকে যত দূর যায় শুধু জল আর জল। তবে এ তো কোনো সাধারণ সমুদ্র নয়। সারা সমুদ্রের জল গাঢ় রক্ত বর্ণ। শুধু কি তাই? এই জল যেন আগ্নেয় গিরির লাভার মত ফুটছে টগবগ করে। আর সেই জলে অসংখ্য মানুষের শরীর প্রতি মুহূর্তে গলছে।

হ্যাঁ যত দূর চোখ যায় এই ভয়াবহ সমুদ্রের জলে মানুষ ক্রমাগত দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু নিঃশেষিত হচ্ছে না। তাদের শরীর থেকে হলে পড়ছে চামড়া, মাংস, হাড়। তবু তাদের মুক্তি নেই! তাদের চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আকাশ বাতাস চতুর্দিক।

এইবার...এইবার যেন সব্যসাচীর মনে হচ্ছে সে প্রকৃত নরকে এসে উপস্থিত হয়েছে। কী যেন এই নরকের নাম?

"নরক বৈতরণীতে জীবাত্মা নয় ছয় নয়কে স্বাগত জানাই। মনুষ্য জন্মকালে যে সকল জীবাত্মা নিজের কর্তব্য কর্ম পালন থেকে বিচ্যুত হয়, নরক বৈতরণীতে তারা আসে পাপস্খালন করতে..."

এই মুহূর্তে আর কিছু যেন কানে ঢুকছে না সব্যসাচীর? ওর মনে ক্রমশ আঁচড় বসাচ্ছে একটাই আতঙ্ক! এই ভয়ঙ্কর ফুটন্ত সমুদ্রের জলে ওকেও কি নিক্ষেপ করা হবে?

হে ঈশ্বর এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তির উপায় কী?

নিচের দিকে তাকিয়েই আরও একবার শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল সব্যসাচীর। এতক্ষণ প্রচন্ড আতঙ্কে ওর যে সকল ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো যেন পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠল। ওর নাকে এসে ঝাপটা মারল মানুষের চামড়া পোড়ার ভয়ঙ্কর গন্ধ। আর তারই সাথে কানে ভাসছে হাজার হাজার মানুষের বেদনা দগ্ধ ভয়ঙ্কর আর্তধ্বনি!

এই ভয়ঙ্কর অগ্নিলাভাময় তরলে প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের ইষ্ট দেবতার নাম ধরে চিৎকার করছে। প্রাণপণে হাহাকার করছে যেন তাদের সেই ইষ্ট দেবতা এসে এই নরক থেকে তাদের রক্ষা করে! কিন্তু হায়, নরকের এই গনগনে আগুন থেকে তাদের কারুর মুক্তি নেই।

"জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে যে নরক বৈতরণীতে আপনার পাপস্খালন শুরু হচ্ছে এই মুহূর্তে।"

সেই পুরুষ কণ্ঠের কথা শেষও হয়নি তার আগেই নিজের পিঠে সজোরে একটা ধাক্কা অনুভব করল সব্যসাচী। পরক্ষণেই ও বুঝল ও শরীরটা শূনতে ভাসছে। ও উপর থেকে নিচে পড়ছে আস্তে আস্তে। তারপর একসময় সেই ফুটন্ত তরলের মধ্যে ঝপ করে একটা শব্দ হল...

কয়েক মুহূর্ত যেন হাবুডুবু খেল সব্যসাচী। পরের মুহূর্তেই মাথা তুলে ভেসে উঠতে লাগল। কী অদ্ভুত! ও যেমনটা ভেবেছিল এ তো আদৌ তা নয়। উপর থেকে এই জল দেখে মনে হয়েছিল এটা ফুটছে। কিন্তু কোথায়। ওর শরীরে তাপ লাগছে না তো! তাহলে?

এইবার সেই পুরুষ কণ্ঠ পুনরায় শোনা গেল,

"জীবাত্মা নয় ছয় নয় কে জানানো হচ্ছে যে বৈতরণী সমুদ্রে আপনার সময় শুরু হচ্ছে এখন। এই সমুদ্র আর কিছুই নয় পরমাত্মা কর্তৃক নির্মিত জগৎ সংসারের একটি ক্ষুদ্র রূপ মাত্র। প্রথমে এই সমুদ্রকে শান্ত সমাহিত মনে হলেও যত সময় অতিবাহিত হবে, তত এই সমুদ্রর প্রকৃত রূপ আপনি অনুভব করতে পারবেন। এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে আপনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনাকে খুঁজে বের করতে নিজের মাঝিকে।"

নিজের মাঝিকে? কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ যেন চমকে ওঠে সব্যসাচী। এই সমুদ্রে আবার মাঝি আছে কোথায়?

"বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্

হে জীবাত্মা, যিনি সর্বভূতের সনাতন কারণ তাকে জানার চেষ্টা করুন। তিনিই বুদ্ধি মানের বুদ্ধি, তিনিই তেজস্বীদের তেজ। তার থেকেই তিন গুণের সৃষ্টি যার প্রভাবে মনুষ্য জন্মকালে জীবাত্মা মোহিত হয়ে থাকে। তিনিই এই জগৎ সংসারে আমাদের মাঝি। আশা করি আপনি খুব শীঘ্রই আপনার মাঝিকে খুঁজে পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের মাঝিকে না খুঁজে পেলে এই বৈতরণীতেই অনন্তকাল বন্দী থাকতে হবে আপনাকে। আপনার সময় হচ্ছে শুরু এখন।"

সব্যসাচী কিছুক্ষণ যেন হতভম্ব হয়ে রইল। ও তো কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথম কথা, এর আগে যতবার সময়ের কথা বলা হয়েছে ততবার কোনো না কোনো ঘড়িতে সময়ের কাঁটা চলছিল। কিন্তু এবার? এবার ঘড়ি কই? ওর জন্য নির্ধারিত সময় ও জানবে কী করে?

আর তার চাইতেও যা অদ্ভুত তা হল এই আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রে মাঝি কোথায়। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর আর্তনাদ করতে থাকা মানুষ। এরমধ্যে না আছে কোনো নৌকা না আছে কোনো মাঝি। এইবার যেন সত্যিই ভয় হল সব্যসাচীর। এর আগে প্রত্যেকবার কোনো না কোনো উপায়ে ও বেঁচে গেলেও এবারে যেন কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না ও!

"হে ভগবান আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমায়। জীবন থাকতে নিজের বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করিনি। টাকা থাকা সত্বেও বাবার চিকিৎসা

করিনি। দেশ বিদেশ ঘুরেছি এদিকে আমার বাবা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু শয্যায় মারা গেছেন। বৃদ্ধা মাকে দিনের পর দিন অবহেলা করেছি, ফিরেও তাকাইনি। আমায় ক্ষমা করো ভগবান, ক্ষমা করো।"

সব্যসাচীর খুব কাছেই একটি লোক জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে আর প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে বলছে কথাগুলো। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর সারা শরীর যেন প্রচন্ড উত্তাপে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

"হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করো। দিনের পর দিন এই দুই হাতে আমি ঘুষ নিয়েছি। জীবনকালে আমি বড় সরকারি আমলা ছিলাম কিনা। ধনী গরীব যেই আমার কাছে আসুক, কারুর থেকে টাকা চাইতে ছাড়িনি। আজ নিজের কর্তব্য কর্ম না করার জন্য জন্য আমার এই অবস্থা। আমায় তুমি এই নরক থেকে মুক্তি দাও আল্লাহ!"

আরেকপাশে আরেকজনের তীব্র চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কি অদ্ভুত! চারপাশে প্রত্যেকে শুধু ভগবানকে ডাকছে। কিন্তু কেন?

"এই জগৎ প্রপঞ্চের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখনই যে তার কথা মনে পড়ে।"

এইবার একটি নবীন পুরুষ কণ্ঠে চমকে উঠল সব্যসাচী। পাশে ফিরতেই দেখে একটা আঠেরো উনিশ বছরের ছেলে জলে সাঁতার কাটছে। ছেলেটার মাথা সম্পূর্ণ ন্যাড়া। গায়ের রং টকটকে ফর্সা।

সব্যসাচী কিছু বলতেই যাবে তার আগেই ছেলেটি মিষ্টি হেসে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আমি গৌড় দাস বাউল। জীবদ্দশায় গাঁয়ে গাঁয়ে বাউল গান গেয়ে বেড়াতাম আরকি। আপনি?"

"আমি সব্যসাচী..."

ছেলেটির মুখে এইবার হাসি ফুটল ফের। হেসেই সে বলল, "কোনো বড় কর্তব্য কর্ম অবহেলা করেছেন বুঝি। নয়তো এই নরকে এলেন..."

ছেলেটির কথায় এইবার যেন সব্যসাচীর টনক নড়ল। সত্যিই তো! কী এমন কর্তব্য কর্ম যা পালন করেনি বলে আজ ওকে এই নরকে পতিত হতে হয়েছে।

একবার ভালো করে ভাবার চেষ্টা করল ও। উহু। আজীবন আর যাই করুক নিজের কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি সব্যসাচী। নিজের মা বাবার প্রতি

যতটুকু ওর করা উচিত ছিল ও সবসময় করেছে। এমনকি নিজের প্রেমিকার সঙ্গে হাজারও বাক বিতন্ডা হওয়া সত্বেও নিজের দায়িত্ব সব সময় পালন করার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, ভাগ্য ওর সঙ্গ দেয়নি, অর্থের বল ওর ছিল না। কিন্তু তাই বলে কর্তব্য থেকে তো বিচ্যুত হয়নি ও। তাহলে?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আচমকা একটা অদ্ভুত জিনিস টের পেল সব্যসাচী। গরম লাগছে! হ্যাঁ হ্যাঁ আস্তে আস্তে একটা উষ্ণতা যেন টের পাচ্ছে ও। প্রচন্ড উত্তপ্ত জিনিসের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়ালেও শরীরে যেমন তার তাপ এসে লাগে, এই মুহূর্তে ঠিক তেমনটাই অনুভব করছে সব্যসাচী। এই সমুদ্রের জল যেন ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে।

আর তারই সঙ্গে আরেকটা অদ্ভুত অনুভূতিও হচ্ছে সব্যসাচীর। কেন জানি না ওর মনে হচ্ছে যে, ওর সময় ক্রমশ কমে আসছে যেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আচমকাই একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল সব্যসাচীর। একটা হাত, জলের মধ্যে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। ও চেষ্টা করছে সেই হাতটা টেনে ধরার। কিন্তু পারছে না। হাতটার তর্জনীতে একটা লাল আংটি। হাতটা ওর ছোটবেলার সবচেয়ে কাছের বন্ধু অরিত্রর।

অরিত্র! নামটা মনে পড়া মাত্র সারা শরীর যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সব্যসাচীর। সত্যিই তো? কী করে একবারও ওর মনে পড়ল না অরিত্রর কথা। ওর স্কুল জীবনের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বন্ধু হিসেবে যা ওর কর্তব্য তা কি ও পালন করেছে?

স্কুল শেষ হতে না হতেই অরিত্রর একটা বড় অ্যাকসিডেন্ট হল। কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই অসাড়। সব্যসাচী তখন সদ্য ভর্তি হয়েছে কলেজে। এদিকে অরিত্র একা। ওর বাড়ির অবস্থাও এমন কিছু ভালো নয়। চিকিৎসার খরচ সামলে কলেজ যাওয়া একরকম অসম্ভব ছিল অরিত্রর পক্ষে।

অথচ এই অরিত্রই দু'চোখ জুড়ে ছিল কত স্বপ্ন! ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর অরিত্রর জীবনটা বদলে গিয়েছিল চোখের নিমেষে। সব্যসাচীও বদলে গেছিল। হ্যাঁ, কলেজে উঠে একরকম যেন ভুলেই গেছিল নিজের বাল্য বন্ধুকে।

তখন অবশ্য একদিকে ওর প্রেম অন্য দিকে কলেজ। পড়া। টিউশন। অরিত্র কতবার করে বলত ওকে দেখা করতে। ও যাচ্ছি যাব বলে কাটিয়ে দিত।

প্রথমটা বাধ্য হয়ে পরেরদিকে নিজের ইচ্ছায়। এই যে অরিত্রর জীবনটা ওর চারদিকেই আবর্তিত হচ্ছে এ ব্যাপারটায় সব্যসাচীর যেন হাঁফ ধরে আসত! হ্যাঁ সব্যসাচী বন্ধু ঠিকই। কিন্তু ওরও ত নিজের জীবন আছে। ও কি সেইদিকে ফোকাস করবে না?

এভাবে অনেকগুলো দিন অনেক উপেক্ষিত ফোন কল আর মেসেজের পর একদিন অরিত্র চুপ হয়ে গেল। ফোন নেই, মেসেজ নেই। সব্যসাচী তখন সেকেন্ড ইয়ার। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল ও। এমনিতেই সংসারের এত সমস্যা, তার মধ্যে এই। সবদিকে তাল দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব ওর কাছে।

কিন্তু তারপরেই সমস্তটা লন্ডভন্ড হয়ে গেল যেন। একদিন আচমকা একটা ফোন এল। সব্যসাচী তখন প্র্যাকটিকাল করে সবে বেরিয়েছে। ফোনটা ধরতেই ওইপারে একটা ক্রন্দন রতা মহিলার কণ্ঠ।

"পিকু, তোর বন্ধু আর নেই। অরিত্র আর নেই রে... অরিত্র আর নেই। আর তোকে ফোন করে ও বিরক্ত করবে না রে। আর বিরক্ত করবে না..."

এক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেছিল সব্যসাচী। কী করবে ভেবে পায়নি। মুহূর্ত গুলো যেন থমকে এক মুহূর্তের জন্য...

ওই দিনটার কথা মনে পড়তেই সব্যসাচীর সারা শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এই দু'হাত! এই দুহাত দিয়েই একদিন ও আর অরিত্র টিফিন ভাগ করে খেয়েছে। সেই হাতেই নিজের বন্ধুকে চুল্লির ভিতর শুইয়ে দিয়েছিল ও। অসাড়, শীতল দেহ। উঁহু ওই দিন অরিত্র আর কিছু বলেনি। মান অভিমান কোনো রকম কথা নয়। নতুন জীবনে প্রবেশ করে ও কেন অরিত্রকে ভুলে যাচ্ছে সেই নিয়ে কোনো গঞ্জনাও নয়। শুধু চোখ বন্ধ করে পরম শান্তিতে শুয়েছিল ও। ওর শরীরটা ঢুকে যাচ্ছিল হা করা চুল্লির ভিতর...

এরপর অনেকগুলো রাত এই দুঃস্বপ্নটা তাড়া করে বেরিয়েছে সব্যসাচীকে। ওর কেবল মনে পড়ত ফোনের ওপারে অরিত্রর বলা কথাগুলো, "সরি তোকে ফোন করে ডিস্টার্ব করলাম রে। আসলে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছিল। তুই ছাড়া তো কথা বলার কেউ নেই..."

কথা...সব্যসাচী তখনও বোঝেনি এই কথাই একটা সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখে। আর কিছু নয়। উপহার, সামাজিকতা, হাজারও লোক দেখানো

জিনিসপত্র কোনো কিছুরই তেমন গুরুত্ব নেই আসলে। মানুষ যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে তার সঙ্গেই সম্পর্ক টেকে।

শুধু আমাদের ব্যস্ত জীবনে আমরা যত এগোই পেছনের একেকটা সম্পর্কের আলোগুলো দপ করে নিভে যায়। সম্পর্ক বানানোর সময় মানুষ একবারও কি ভাবে একদিন আচমকা হঠাৎ এই সম্পর্কটা নিভে গেলে উল্টো দিকের মানুষটার উপর কী প্রভাব পড়বে?

সুন্দর একটা সম্পর্ক বানানো যেমন মানুষের কর্তব্য তেমনই সেটাকে যত্ন নিয়ে ধরে রাখাও কি তার কর্তব্য নয়! মানুষ তো ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন নয় যে আজ ইচ্ছে হল সম্পর্ক রাখলাম, কাল প্রয়োজন নেই তাই ভুলে গেলাম! অথচ সব্যসাচী ঠিক এটাই করেছে অরিত্রর সাথে।

"আআআ!" আচমকাই প্রচন্ড গরমে এইবার চিৎকার করে উঠল সব্যসাচী। জ্বলছে, প্রচন্ড উত্তাপে ওর শরীর যেন ক্রমশ পুড়তে শুরু করেছে। এইবার ও টের পাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রের প্রকৃত রূপ। ও যেমনটা ভেবেছিল তেমনটা মোটেও এই সমুদ্র নয়...

"আপনি কী কারণে এখানে এসেছেন?" ওই ক্রমাগত উষ্ণ হতে থাকা জলের মধ্যে হাবু ডুবু খেতে খেতেই সব্যসাচী পুনরায় প্রশ্ন করল ছেলেটাকে।

"আজ্ঞে তাকে জানিনি বলে!"

"মানে?"

সব্যসাচীর কথা শুনে ছেলেটা হাসে। তারপর বলে, "গাঁয়ে গাঁয়ে তার নাম করে বেড়িয়েছি। মুখে সর্বদা তার গান। অথচ তাকে যে কখনও চেনার চেষ্টাই করিনি!"

"কাকে চেনার চেষ্টা করেননি?"

লোকটা এইবার সাঁতার কেটে এগিয়ে আসে সব্যসাচীর দিকে। তারপর রহস্যময় হাসি হেসেই বলে, "এই জগতে আমাদের সবচাইতে কর্তব্য কী জানো?"

"কী?"

“তাকে জানা। তাকে জানার চেষ্টা করা। তার থেকেই সব সৃষ্টি অথচ দেখো এই জগৎ সমুদ্রে পড়ে সম্পর্কের মায়াজালে আমরা এমনই হাবুডুবু খাচ্ছি যে তাকে জানার কথাই ভুলে যাই!”

ছেলেটার কথা এইবার যেন আরও রহস্যময় মনে হয় সব্যসাচীর। ও কিছু বলতেই যাবে তার আগেই ছেলেটা আরও কাছে সরে আসে ওর। ফিসফিস করে কানে বলে, “তুমি যাকে খুঁজছ, সেই মাঝি তোমার মনের মানুষ গো। এই জগৎ সংসার, এই মায়ার বন্ধন এসব তো তারই সৃষ্টি। মায়ার বশে আমরা তাকে চিনতে পারিনে। তবে মন থেকে ডাকলে তিনি ঠিকই আসেন...”

কথাগুলো বলতে বলতেই ছেলেটি এইবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। পরক্ষণেই অবাক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, “ওই আমার মাঝি আমায় নিতে এসেছে। আমি আসি!”

এইবার সব্যসাচী অবাক হয়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও দেখে ছেলেটা শূন্যে কার দিকে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই ছেলেটার শরীর অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তেই।

অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় গেল ছেলেটা? ও যে মাঝির কথা বলছিল সে কি সত্যি? ও কি সত্যিই মুক্তি পেল এই নরক থেকে!

সব্যসাচী এইবার চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখে। সত্যিই তো। এর আগে ও খেয়াল করেনি। কিন্তু কিছু মানুষ সত্যিই শূন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারপর তাদের শরীরগুলো আচমকাই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনেই!

এইবার সমুদ্রের জল রীতিমত যেন ফুটতে শুরু করেছে। সেই গনগনে আগুনের তেজ ক্রমশ যেন সারা শরীরে অনুভব করছে সব্যসাচী! ওর চামড়া একটু একটু করে পুড়তে শুরু করেছে! এ কি সত্যিই ওর এই ভ্রম শরীরের দহন নাকি সংসারের অগ্নিসমুদ্রে এইভাবেই একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মনুষ্য জীবন?

“মায়ার বশে আমরা তাকে চিনতে পারিনে। তবে মন থেকে ডাকলে তিনি ঠিকই আসেন...” লোকটার বলা কথাগুলো যেন কানের সামনে বারবার বাজছে সব্যসাচীর। মনের মধ্যেও কেউ যেন ওকে ক্রমশ জানান দিচ্ছে ওর সময় ক্রমশ

শেষ হয়ে আসছে। ক্রমশ যেন এই নরকের আসল নিয়ম বুঝতে পারছে ও। ওর মন, ওর মনই এই খেলার আসল ঘড়ি। কোথাও কিছু বলা নেই। তবু ও ঠিকই বুঝতে পারছে ওর সময় ফুরোচ্ছে। ঠিক যেমন মৃত্যু নিকটে এলে মানুষ বুঝতে পারে তার সময় আসন্ন।

আরও একটা ভাবনা এই ফুটন্ত জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতেই ক্রমশ বুকে জমাট বাঁধছে সব্যসাচীর। এই সমস্ত কিছু যা ওর সঙ্গে ঘটছে তা যেন পূর্ব নির্ধারিত। কেউ যেন অতি যত্নে সবটা ঠিক করে রেখেছে। এই নরকে আসা থেকে এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটা পর্যায়ে কেউ না কেউ ওকে সাহায্য করেছে। কেউ না কেউ ওকে পথ দেখিয়েছে।

শুধু নরক কেন! হয়তো ওর পুরো জীবনটাই এমনভাবেই সাজানো। আগে থেকেই। তারমানে শুধু ওর জীবনটাই নয়, এই পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনও কোনো একজন নিয়ন্ত্রন করছে। যে পৃথিবী ও নিজের চোখে দেখেছে তাও কোনো একজনেরই সৃষ্টি?

বেঁচে থাকতে খুব একটা আস্তিক না হলেও ভগবানে অবিশ্বাস ছিল না সব্যসাচীর। বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেওয়া, মানত করা সবই সে করেছে টুকটাক। কিছু কিছু ফল লাভ হয়েছে কিছু কিছু হয়নি। ও ভেবেছে সেসব বুঝি সেইসব দেবতাদের মাহাত্ম্য।

তবে কি ও ভুল ছিল? কোনো এক শক্তি আসলে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রন করছে? তাকেই মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী, নিজের নিজের উপাচার মতে পুজো করছে? ওই এক এবং অদ্বিতীয় চেতনাই কি মানুষকে দান করছে তার কাঙ্খিত বস্তু আর মানুষ ভাবছে এ তার নিজস্ব ইষ্ট দেবতার দান!

তার মানে... আস্তে আস্তে এইবার যেন সবটা পরিষ্কার হচ্ছে সব্যসাচীর কাছে। ভগবানকে এর আগেও সে ডেকেছে। তবে তার ঐশ্বর্যকে, তার মাহাত্ম্যকে, তার এই বিরাট জগন্ময় সত্ত্বাকে এই প্রথমবার যেন উপলব্ধি করতে পারছে। আর যত উপলব্ধি করছে ততই ভেতরে ভেতরে নতজানু হচ্ছে যেন। যদি সত্যিই এই সমস্ত কিছু একজনই নিয়ন্ত্রন করে, যদি তার ইচ্ছে এই জগতের একটা পাতাও না নড়ে, তাহলে সত্যিই তো, তাকে জানা ছাড়া মনুষ্য জীবনের আর কি কর্তব্য থাকতে পারে?

সেই পরম শক্তি, সেই জগন্ময় চেতনা, সেই সনাতন সত্ত্বা কি ওকে এখান থেকেও রক্ষা করবে? তার ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না। পারলে সেই পারবে এই সংসার বৈতরণী থেকে ওকে মুক্তি দিতে।

এইবার মনে মনে পরম ভক্তি ভরে সব্যসাচী প্রার্থনা করে। উহু কোনো বিশিষ্ট ইষ্ট দেবতাকে নয়। বরং সেই অনাদি অনন্ত সত্বাকে যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল কিছুর উর্ধ্বে। সত্ত্ব, রজ, তমো এই তিনগুনের আবরণে ঢাকা পড়া মনুষ্য চেতনা, এই সকল গুনাতীত যে পরমাত্মার নাগাল পায় না তাকেই মন থেকে ডাকে সব্যসাচী!

আচমকাই এইবার প্রচন্ড আলোকে চোখ ঝলসে যায় সব্যসাচীর। চোখ খুলতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ও। আকাশ থেকে নেমে আসছে এক অদ্ভুত দর্শন যান। একটা বড় চাকতির মত দেখতে যানটাকে। শুন্যে ভাসমান অবস্থায় ধীরে ধীরে নেমে আসছে ওটা সব্যসাচীর দিকে। ওর উপরে দাড়িয়ে আছে একজন লোক। তার সমস্ত শরীর থেকে যেন জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

এইবার সেই চাকতিটার উপর দাড়িয়ে থাকা লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল সব্যসাচীর দিকে। সব্যসাচী হাতটা বাড়িয়ে দিল। ইনিই কি তবে সেই? নিজের হাতেই একটা টান অনুভব করল সব্যসাচী। পরের মুহূর্ত ও বুঝল ও সেই উড়ন্ত চাকতির উপর উঠে পরেছে।

কিন্তু তবুও তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মুখ যেন ও দেখতে পাচ্ছে। এত আলো! এত আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে... সব্যসাচীর মনে হচ্ছে এত আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। ও অনুভব করছে চাকতিটা ধীরে ধীরে শুন্যে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

“আপনি কে প্রভু?” কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে সব্যসাচী।

সামনের সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ এইবার উত্তর দেয়, “অহম ব্রহ্মস্মি। আমিই ব্রহ্ম!”

সব্যসাচীর সারা শরীরে এইবার যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে! তাহলে সব্যসাচীর নরক যন্ত্রনা শেষমেশ সমাপ্ত হল। যে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য এত কিছু তিনি নিজেই তো স্বয়ং এসেছেন ওকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে

যাওয়ার জন্য। তাহলে আর নিশ্চয়ই ওর চিন্তা নেই। এই নরক থেকে নিশ্চয়ই এবার মুক্তি পাবে ও...

তবে এরপর যা ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না সব্যসাচী! আচমকাই সেই পরম জ্যোতির্ময় পুরুষ তার হাতখানা বাড়িয়ে সজোরে ধাক্কা মারল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে সেই চাকতির থেকে পিছলে গেল ওর পা। ও অনুভব করল ও আবারও নিচে পড়ে যাচ্ছে। নিচে নিচে... অনেক নিচে... উপরে শূন্যে ভাসমান সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ যেন হাসছে ওকে দেখে...

এটা কী হল? যে ভগবানের স্মরণাপন্ন হয়, ভগবানকে বুঝে, তাকে ভালবেসে ভক্তি ভরে ডাকে ঈশ্বর কি তাকেও ঠেলে দেন নিশ্চিত বিপদের দিকে? কিন্তু কেন? ঈশ্বরের এ কেমন ইচ্ছে?

সব্যসাচী অনুভব করল ওর শরীরটা ক্রমশ যেন তলিয়ে হচ্ছে কোনো এক অনন্ত অন্ধকূপের মধ্যে!

অষ্টম অধ্যায়

॥ অক্ষর ব্রহ্ম যোগ ॥

অন্ধকার। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। এ কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছে সব্যসাচী? এও কি আরেকটা কোনো নরক! হিসেব মত আরও দুখানা নরকে ওর শাস্তি ভোগ করার কথা এখনও। তাহলে ও এখন কোথায়? হিসেব মত ওর এখন পরবর্তী নরক অন্ধ কূপে থাকার কথা। এই কি সেই জায়গা?

আচমকাই অন্ধকারের মধ্যেই একটা শব্দে চমকে উঠল সব্যসাচী। ব্যাপারটা আগে খেয়াল না করলেও এইবার যেন স্পষ্ট টের পেল অতি ক্ষীণভাবে হলেও একটা শব্দ বহুক্ষণ ধরে যেন বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কী এই শব্দ? চোখ বন্ধ করে একবার ভালো করে শোনার চেষ্টা করল সব্যসাচী। পরক্ষণেই ওর সর্বাঙ্গ যেন শিহরিত হয়ে উঠল।

যে শব্দ ও শুনতে পাচ্ছে তা আর কিছুই নয়, ওঙ্কার ধ্বনি। এই আদি অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীনতম শব্দ!

"ওঁম..."

বেশ কিছুক্ষণ শব্দটা শুনে মনটা যেন স্থির হয়ে এল সব্যসাচীর। একটু আগেও যে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ ওর মনে কামড় বসাচ্ছিল তা থিতু হলে এল আপনা থেকেই। কাদা গোলা জল কিছুক্ষণ রেখে দিলে কাদা যেমন সময়ের সাথে নিচে থিতিয়ে পড়ে, এই ওঙ্কার ধ্বনিতে ওর মনের সমস্ত দ্বিধা দন্ধ তেমন ভাবেই একে একে থিতিয়ে পড়তে লাগল।

একে একে শুরু থেকে সবটা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল যেন। ওর আত্ম হত্যা, তারপর এই নরকে আসা। কর্ম যজ্ঞের প্রথম পর্যায়ের সেই ভয়ঙ্কর খেলা, তারপর সেই বাড়ি, মায়ের আত্মত্যাগ। দ্বিতীয় পর্যায়ের অদ্ভুত নরক যন্ত্রনা। সেই ফুটন্ত বৈতরণীর জল, ওর প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকা... সেই অনাদি সনাতন পরমাত্মার প্রতি অবিচল ভক্তি... সেই অপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষ... তার মাঝি তাকে নিতে আসছে... সে উঠে পড়েছে নৌকায় আর তারপর...

"হে জীবাত্মা কর্ম যজ্ঞের তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে আপনাকে স্বাগত।" একটা ছোট্ট বাচ্চার কণ্ঠে চমকে উঠল সব্যসাচী।

চোখ খুলতেই প্রথমটা প্রচন্ড আলোয় চোখ ঝলসে গেল ওর। কোথায় সেই দিগন্ত ব্যাপী অন্ধকার! চারিদিকে এখন কেবল আলো আর আলো। এ কোথায় বসে আছে সব্যসাচী। এ কি জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কোনো স্টেশন? সামনে দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা ছেলে।

"আমি তৃতীয় পর্যায়ে এলাম কী করে? আমার তো এখনও দুটো নরকে দণ্ড ভোগ করা বাকি ছিল।"

অবাক হয়ে চারিপাশে দেখতে দেখতেই জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী। ও এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছে তার থেকে কয়েক হাত দূরে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে কেবল। বাকি চারপাশেই শুধু আলো আর আলো,সেই প্রবল জ্যোতিতে সমস্ত যেন ঢাকা পড়েছে।

"তোমার জ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই কারণেই এখানে এসেছ। নরক তো দণ্ড ভোগের স্থান নয়, জীবাত্মার জ্ঞান লাভের স্থান। যার যত আগে জ্ঞান লাভ হয় সে তত আগে নরক ত্যাগ করে এখানে এসে পৌঁছায়..."

ছেলেটার বয়স দশ কি এগারো হবে। আদুল গা। নিচে একটা ছোট্ট ধুতির মত পরা। মুখে সুন্দর দর্শন একটা ময়ূরের মুখোশ।

"তুমি সকলের থেকে একদম আলাদা এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কত লক্ষ কোটি জীবাত্মা কত সহস্র বছর নরক যন্ত্রনা ভোগ করে। তবু তাদের নরক ভোগ শেষ হয় না। অথচ তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত সবকটা নরকে দণ্ড ভোগের আগেই সেই পরম সত্যকে মন থেকে উপলব্ধি করেছ..."

"সত্য? কোন সত্য? আমি তো কেবল একাগ্র মনে তাকে ডেকেছিলাম আমায় রক্ষা করার জন্য..."

ছেলেটি আবার হাসে। তারপর বলে,

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ

যে আমাকে একাগ্রচিত্তে ভক্তি ভরে নিরন্তর স্মরণ করে, আমি তার কাছেই সুলভ হই।"

এতটুকু বাচ্চা ছেলে, অথচ কথাগুলো এমন গম্ভীরভাবে বলল যে সব্যসাচীর সারা শরীর যেন শিহরিত হয়ে উঠল। ছেলেটি এইবার এসে সব্যসাচীর ডান হাত খানা চেপে ধরল।

"আমার সাথে এসো।"

সব্যসাচী কিছুক্ষণ যেন স্থির হয়ে থাকে। তারপর কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটা এইবার ওকে টেনে নিয়ে যায় সামনের দরজাটার দিকে। দরজার সামনে এসে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে যাবে তখনই সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে,

"তুমি কে?"

ছেলেটি এইবার হাসে। ফের রহস্যময় কণ্ঠে বলে, "হে জীবাত্মা, আমি তো তোমার সখা। আমায় অনুসরণ করো, আমি তোমায় বলছি আমি কে!"

****

দরজার ভিতরে পা রাখা মাত্রই চমকে ওঠে সব্যসাচী। এক অদ্ভুত আয়না নগরীর মধ্যে যেন ঢুকে পড়েছে ও। যেদিকেই চোখ যাচ্ছে কেবল আয়না আর আয়না। কিন্তু কী অদ্ভুত একেকটা আয়নার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একেকজন অচেনা মানুষ!

ছেলেটি এইবার খিল খিল করে হেসে উঠে বলে, "তুমি আমায় খুব চিন্তায় ফেলেছ বুঝলে। তোমায় নিয়ে যে কী করি বুঝতে পারছি না।"

"মানে?"

"মানে জীবাত্মারা যে বিশেষ সময়ে বা পক্ষে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে তখনকার তিথি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যে সে আবার মনুষ্য লোকে যাবে না আমার সঙ্গে পরম ধামে। তবে তোমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা..."

পরম ধাম! সে আবার কী?"

সব্যসাচীর বিস্ময় ভরা প্রশ্নে ছেলেটি আবারও ওর হাত চেপে ধরে। তারপর ওকে নিয়ে এগোতে থাকে সামনের দিকে।

"এই যে আয়না গুলো দেখছ, এতে যাদের দেখতে পাচ্ছ এরা কারা বলো তো?"

"কারা?" কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

"আয়নায় কাকে দেখা যায়? জানো না!"

"সে জানব না কেন। কিন্তু এরা তো..." কথাগুলো বলতে গিয়েই থমকে যায় সব্যসাচী। এক অদ্ভুত অব্যক্ত অনুভূতিতে আবারও ওর শরীর জুড়ে শিহরণ খেলে যায়।

এই যে এত আয়না... এই যে আয়নার ভিতর থেকে উঁকি মানুষ বা জন্তু এগুলো আর কেউ নয়, স্বয়ং ও নিজে! তারমানে এগুলো নিশ্চিত ওর আগের প্রত্যেকটা জন্মের রূপ।

"ঠিক ধরেছ। এরা সবাই তোমার আগের জন্মের রুপই..."

এইবার সব্যসাচী অবাক হয়ে একেকটা আয়নায় উঁকি দিতে থাকে। কোনো আয়নায় উঁকি মারে প্রবল পরাক্রমশালী পুরুষ তো আয়নায় উঁকি মারে অপরূপ সুন্দরী রমণী। কোথায় পশু, কোথাও পক্ষী কোথাও আবার কীট পতঙ্গ। একটার পর একটা আয়না দেখতে দেখতে সব্যসাচী অবাক হয়ে যায়!

এর আগে কত হাজার বার ও জন্মেছে! কত হাজার রূপে পৃথিবীকে দেখেছে। আর কত হাজার বার মৃত্যু বরণ করেছে। অথচ ওর সেসব কিছুই মনে নেই। হয়তো এরপরের জীবনেও থাকবে না...

"কর্ম যজ্ঞের তৃতীয় পর্যায় অত্যন্ত সহজ। এই পর্যায়ে আমি তোমায় তিনটে প্রশ্ন করব। যদি তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দাও। তাহলেই তুমি নিজের জন্য কাঙ্ক্ষিত জীবন বেছে নিতে পারবে।"

সব্যসাচী ছেলেটার কথার কোনো উত্তর দেয় না। ও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। কোনো ভয়ঙ্কর সত্য আচমকা মানুষের সামনে উপস্থাপিত হলে মানুষ যেমন কিছুক্ষণের জন্য বিচার বুদ্ধি হারায়, ওরও তেমনই অবস্থা। ওর মনের ভিতর সমস্ত কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু জটলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

যদি সত্যিই এতবার ও জন্ম নিয়ে থাকে, যদি সত্যিই ও এত হাজার বার এই দুনিয়ায় এসে থাকে তাহলে ও মৃত্যু বরণ করল কেন খামোখা? ও তো এমনিই মারা যেত কালের নিয়মে। এতগুলি জন্ম, এত সুখ, এত দুঃখ... তারপরে সামান্য এই কারণের জন্য মৃত্যুবরণ। হ্যাঁ, আচমকাই ওর নিজের মৃত্যুর কারণটাকে বড্ড ছোট বলে মনে হচ্ছে যেন।

"হে জীবাত্মা, তোমার প্রথম প্রশ্নের সময় হয়েছে! করতে পারি? যদি তুমি সঠিক উত্তর দাও এখানে উপস্থিত সকল মায়া দর্পণগুলি তৎক্ষণাৎ ভেঙে চুর্ণ হয়ে যাবে।"

বাচ্চা ছেলেটি স্নেহ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

"করো।" তন্ময় কণ্ঠে উত্তর দেয় সব্যসাচী।

"হে জীবাত্মা, তোমার এতগুলি জন্ম তুমি নিজের চোখে চাক্ষুষ করছ। বলো তবে, তোমার পরম আত্মীয় কে?"

সব্যসাচী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে। কোনো শব্দ করে না। ওর কানে এখনও বাজছে সেই ওঙ্কার ধ্বনি।

"তুমিই আমার পরম আত্মীয় সখা!"

"কীভাবে?" বাচ্চা ছেলেটি জিজ্ঞেস করে।

"জন্মের পর জন্ম আমি এক একবার এক এক শরীরে পৃথিবীকে দর্শন করেছি। এক একবার এক এক মায়ের স্নেহ পেয়েছি, এক একবার এক

একজনের প্রেমে আসক্ত হয়েছি। কখনও বীরদর্পে মৃত্যু বরণ করেছি, কখনও পরিস্থিতির শিকার হয়ে। এই প্রতি জন্মে আমি নিজেই নিজের অস্তিত্ব সমন্ধে অবগত ছিলাম না। প্রত্যেকটা জীবনকেই আমি আসল মনে করেছি। তার পাওয়ায় না পাওয়ায়, সুখে দুঃখে, মোহে এবং মায়ায় ভুলে থেকেছি...”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব্যসাচী। তারপর বলে, “কিন্তু এই এত গুলি জন্মে কেউ যদি আমায় প্রকৃত রূপে পথ দেখিয়ে থাকে তা হল তুমি। প্রতিটি জন্মে তুমিই আমায় ভালবেসেছ, তুমিই পথ দেখিয়েছ। যতবার একাগ্র মনে তোমায় ডেকেছি তুমি সহায় হয়েছ। কেবল কর্মের বন্ধনে চোখদুটো ঢাকা ছিল তাই তোমায় বুঝতে পারিনি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি তিনি ছাড়া মানুষের আর কোনো আত্মীয় নেই। থাকতেই পারে না। তুমিই আমার প্রকৃত আত্মীয় সখা। তুমিই ছিলে, তুমিই আছো, তুমিই থাকবে।”

কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড ঝনঝন শব্দে চারিদিক কম্পিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সব্যসাচী দেখে চারিদিকের সমস্ত আয়না বিচূর্ণ হয়েছে। আর তার সামনে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত গুহার দ্বার। সেই গুহার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রহস্য ময় অন্ধকার।

“প্রথম প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছ। এসো আমার সাথে এসো। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের সময়।”

নবম অধ্যায়

॥ রাজ গুহ্য যোগ ॥

গুহার ভিতর আবছায়া অন্ধকার। তার মধ্যে দিয়েই বাচ্চা ছেলেটি এগিয়ে যাচ্ছে। ও মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেললেও ওর মুখটা এখনও স্পষ্ট ভাবে দেখেনি সব্যসাচী। ছেলেটার হাতে ধরা একখানা বাঁশি। সেই বাঁশির সুর শুনতে শুনতে গুহার চড়াই উতরাই পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সব্যসাচী নিজেও। ওর হাতে ছোট্ট একটি প্রদীপের শিখা। সেই টিমটিমে প্রদীপের আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে।

“তুমি পরম ধামের কথা বলছিলে সখা, সেটা কী?”

"সেটা আমার অব্যয় অক্ষর রূপ। সেখানে যারা যায় তারা আর এই জন্ম মৃত্যুর আবর্তন চক্রে ফিরে আসে না।"

ছেলেটির অপূর্ব বাঁশির সুর যেন সব্যসাচীর শরীরে, মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করছে। সেই সুরে সুরে ওর শরীর জুড়ে যেন এক তীব্র আনন্দের ভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

তারই সঙ্গে হাতে ধরা প্রদীপের আলোয় গুহার প্রাচীর গাত্রে ফুটে উঠছে একেকটি অদ্ভুত ছবি। সেই সকল ছবিতে ফুটে উঠছে নানান রকম অদ্ভুত ঘটনার কথা। কখনও যুদ্ধ, কখনও মহামারী কখনও আবার ভয়াবহ বন্যা। এই গুহার গাত্রে যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস কেউ চিত্রাঙ্কন করে রেখে গেছে।

"হে জীবাত্মা, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আমারই রচনা। আমিই এই সকল সৃষ্টি করেছি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যেই অবস্থিত।"

সব্যসাচী কথাখানা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সত্যি বলতে বাচ্চাটির কথা বিশ্বাস করতে তার খুব ইচ্ছে করে। আর তারপরেই মনে শঙ্কাও জাগে। এতটুকু বাচ্চা! সে কিভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা হতে পারে। এও কি সম্ভব?

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্

হে জীবাত্মা, আমিই সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরন ও সুহৃৎ। আমিই উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয় বীজ। এই গুহা আর কিছুই নয়, আমার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন লাভের পথ মাত্র। এই গুহার গাত্রে আঁকা প্রতিটি ছবি এই অনন্ত কাল খন্ডের প্রতিচ্ছবি। যার শুরুতেও আমি ছিলাম, মধ্যেও আমি আছি, অন্তেও আমি থাকব।"

ছেলেটা এইবার থামে। তারপর হেসেই বলে, "আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে প্রায় উত্তর দেয় সব্যসাচী। যদিও এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারও প্রশ্ন।

এইবার গুহার একটা জায়গায় এসে দাড়িয়ে যায় বাচ্চা ছেলেটা। প্রদীপের আলোয় দেখা যায় সামনে একটা বিস্তৃত জলাশয়। আর সেই জলাশয়ের ঠিক

মাঝখানে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রাখা আছে একটি ফলের ঝুড়ি। সেই দিকে তাকিয়েই ছেলেটি বলে।

“এইবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় হয়েছে। ওই ফলের ঝুড়িটি দেখতে পাচ্ছ?”

“হ্যাঁ পাচ্ছি।”

“ওর মধ্যে পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ ফলটি রাখা আছে। তুমি আমায় ওর মধ্যে থেকে সেই সর্ব শ্রেষ্ঠ ফলটি খুঁজে এনে দাও যা খেলে মানুষের অমৃত লাভের সমান সুখ হয়। যদি তুমি মনে মনে জানো সঠিক ফল কোনটি তাহলে এই জলে পা দিলেও তোমার শরীর ডুববে না। স্থলে হাঁটার মতই অভিজ্ঞতা হবে তোমার। কিন্তু যদি তুমি ভুল ফলকে সঠিক মনে করে আনতে যাও তাহলে এই জলরাশি তক্ষুনি তোমায় গ্রাস করবে।”

সব্যসাচী ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সুবিশাল ঝুড়িটা ওর চোখের সামনেই শূন্যে ভাসছে। সত্যিই সেই ঝুড়ি থেকে উঁকি মারছে অসংখ্য চেনা অচেনা ফল। কিন্তু এতসব ফলের মধ্যে কোনো একটা ফল সর্ব শ্রেষ্ঠ হবে কী করে? আর কেনই বা হবে?

এই নরকসম পৃথিবীতে, যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ অসহ্য জীবন যন্ত্রনা সহ্য করছে, সেখানে আদৌ কি এমন কোনো ফল আছে যা খেলে অমৃত লাভের সমান সুখ হয়? এও কি সম্ভব!

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই হঠাৎই সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে সব্যসাচীর। ঠিক যেন চেতনার অতল সমুদ্র থেকে সে ডুব দিয়ে খুঁজে এনেছে তার বহু ঈপ্সিত প্রশ্নের উত্তর। তৎক্ষণাৎ ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

খানিকটা নিরুদ্বেগ ভাবেই জলের মধ্যে পা বাড়ায় ও। কি অদ্ভুত! ওর পা জলে পড়া সত্বেও ও ডুবে যায় না। যেন কোন এক অলীক মন্ত্র বলে ও সেই জলরাশির উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে হাঁটতে শুরু করে।

সব্যসাচী হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে জলের উপর। জল নয় যেন সংসার বারিধী। পিছনে সেই বাচ্চা ছেলেটি অপূর্ব সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে। একসময় সব্যসাচী এসে দাঁড়ায় সেই ঝুড়ির সামনে।

তারপর সমগ্র ঝুড়িটা হাতে নিয়েই হাসতে হাসতে ফিরে আসে বাচ্চা ছেলেটির সামনে। তার পায়ের সামনে ঝুড়িটি রেখে হাসে ও।

"এর মধ্যে কোন ফলটি দুনিয়ায় সর্ব শ্রেষ্ঠ?" বাচ্চা ছেলেটি জিজ্ঞেস করে। তার পায়ের কাছে রাখা প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় তার মুখ এখনও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

"আজ্ঞে, ভক্তি। ভক্তিই এই দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ট ফল। একমাত্র তোমায় জেনে, তোমায় ভালোবেসে প্রকৃত ভক্তির মাধ্যমেই এই যন্ত্রনাময় জগতে প্রকৃত অমৃত লাভের সুখ অনুভব করা সম্ভব। আমি ভক্তি ভরে এই সকল ফল তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। এক্ষণে এগুলিও অমৃত সম গুণ লাভ করবে।"

সব্যসাচী এইবার নত মস্তকে প্রণাম করে বাচ্চা ছেলেটিকে। ছেলেটিও তার মাথায় হাত রাখে। মিষ্টি হেসে বলে, "তথাস্তু!"

এরপর কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতা। তারপরেই ছেলেটি ফের বলে, "এইবার সময় হয়েছে কর্মযজ্ঞের অন্তিম প্রশ্নের। তুমি কি তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তে গুহার অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। তার বদলে ওর সামনে ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত জগৎ। চারিদিকে অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি যেন ডালপালা মেলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে পর্বতমালা, অদূরে বয়ে যাচ্ছে নদীর জল। এক পাশে অরণ্য, অন্য প্রান্তে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর। আর উপরে অনন্ত আকাশ। যেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে সব্যসাচী।

কিন্তু সেই বাচ্চাটি? সেই বাচ্চাটি কোথায় গেল? ও তো এখানেই ছিল।

এইবার আচমকাই আকাশ থেকে শোনা যায় সেই বাচ্চা ছেলেটির কণ্ঠ, "হে জীবাত্মা, তোমায় আমি শেষ প্রশ্ন করছি। বলো আমি কে?"

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে যেন ধেয়ে আসে সেই একই কণ্ঠস্বর। সব্যসাচীর মনে হয় এই আকাশ, এই বাতাস, এই জল, ফুল ফল নদী, পর্বত, অরণ্য থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একই শব্দ। এই জগৎ সংসারের সর্বভূতে বিরাজমান সেই অনাদি চেতনা আজ যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করছে,

"বলো আমি কে?"

দশম অধ্যায়

॥ বিভূতি যোগ ॥

“বলো আমি কে?” চারিদিক থেকে ভেসে আসা সেই প্রশ্নে কিছুক্ষণ যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সব্যসাচী।

নরকের এই দীর্ঘ যাত্রায় ও যা কিছু জেনেছে, যা কিছু অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছে, এই প্রশ্ন যেন সেই সকল আত্ম অনুভূতির সামনে দাড়িয়ে থাকা এক অনন্ত বিস্তৃত প্রশ্ন প্রাচীর, “বলো আমি কে?”

সব্যসাচী এইবার ধপ করে মাটির উপর বসে পড়ে। কিছুক্ষণ যেন স্থির হয়ে থাকে। কী করে বলবে ও এই প্রশ্নের উত্তর? যাকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা মানুষ কেন, দেব দেবতা, রক্ষ যক্ষ কারুর পক্ষেই সম্ভব না তার প্রকৃত পরিচয় সব্যসাচী কিভাবে দেবে?

তবে কি কর্ম যজ্ঞের এই শেষ পর্যায়ে এসে হার মানতে হবে ওকে? এই কি তবে সমাপ্তি? এক অদ্ভুত নীরবতা যেন ক্রমশ গ্রাস করছে ওকে।

সত্যিই তো জীবনের উত্থানে পতনে, সুখে দুঃখে যে পরম আরাধ্যের কাছে আমরা মুহুর্মুহু ছুটে যাই, যার কাছে আমাদের সকল আবদার, সকল চাহিদা, মান অভিমান সমস্ত কিছু...সে আসলে কে তা কখনও আমরা ভেবে দেখেছি কী? নাকি ঈশ্বর আমাদের কাছে পরিণত হয়েছে শুধুই একটা আদান প্রদানের মাধ্যমে?

এই এই তোমায় উৎসর্গ করলাম, এই এই মনস্কামনা পূরণ করো...জীবদ্দশায় এইটুকুই ছিল সব্যসাচীর ঈশ্বরের সাথে যোগসূত্র। সত্যিই তো নিজের চাহিদার সময় ছাড়া তার ব্যাপারে ভাববার জন্য এক মুহূর্তও কখনও খরচ করেনি ও। তাহলে আজ ও কী ভাবে বলবে সর্বভূতে সমাচ্ছন্ন এই পরম চেতনা আসলে কে?

এক মনে এসবই ভাবছিল আচমকাই আবারও সেই বাঁশির সুরে ওর সারা শরীর যেন শিহরিত হয়ে ওঠে। আকাশে বাতাসে সর্বত্র থেকে সেই বাঁশির সুর ভেসে আসছে না? হ্যাঁ তাই তো, ও যদি খুব ভুল না হয় তাহলে এই আকাশ,

বাতাস, নদী, পর্বত সমস্ত কিছুর বুকে বাজছে সেই করুণাময় অপূর্ব বাঁশির সুর। সেই সুরে ধীরে ধীরে যেন সমাহিত হচ্ছে সব্যসাচীর মন।

এইবার ধীরে ধীরে ওর মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে মানুষ আপনার সাথে দ্বন্দ্ব করে। সেই দ্বন্ধে হাজারও প্রশ্ন উত্তরের পর শেষমেশ সে যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তার মুখে যেমন প্রশান্তির হাসি লেগে থাকে সব্যসাচীর মুখেও সেরকমই হাসি। দু'চোখের কোণায় বিন্দু বিন্দু জলও কি চিক চিক করছে?

এইবার এক অদ্ভুত বেদনার্ত কণ্ঠে সব্যসাচী বলে, "হে সখা, তুমি কে এই প্রশ্নের উত্তর কেমনভাবে দিই। বেঁচে থাকতে কখনও তোমাকে জানার চেষ্টা করিনি। গোটা জীবন হয় ছুটেছি অর্থের পিছনে নয়তো সম্পর্কের পিছনে। মানুষকে ভালোবাসতে কি না করেছি, বুকের ভিতরটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে সামান্য ভালোবাসা ভিক্ষা পাওয়ার জন্য। অথচ সৃষ্টির আদি অনন্তকাল থেকে যে আমায় ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছে তাকেই অবজ্ঞা করেছি।

অর্থের পেছনে, ঠুনকো সম্পর্কের পেছনে, হাজারও ভোগ বাসনার পেছনে ছুটতে ছুটতেই এত গুলো জীবন পেরিয়ে এলাম। তবু চৈতন্য হল না সখা। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রইলাম। তাই এই পাপের মুখে কেমন করে বলব তোমার অপার বিভূতির কথা? তবু তুমি যখন জানতে চাও বলছি শোনো..."

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সব্যসাচীর দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু ধারা। আর্দ্রকণ্ঠেই সে বলে, "হে সখা অতি ক্ষুদ্র কূপের মধ্যে থাকা মাছকে সমুদ্রের ব্যাপ্তি জিজ্ঞেস করলে সে যেমন কোনোদিনই তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। তেমনই কোনো জীবাত্মার পক্ষে তোমায় সম্পূর্ণ রূপ জানা না ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শুধু জীবাত্মা কেন দেব দেবতা রক্ষ যক্ষ কেউই তোমায় সম্পূর্ণ জানতে পারে না, কারণ তুমি অজ্ঞেয় অনন্ত।

তবু আমার ভক্তির মাধ্যমে যতটুকু অনুধাবন করেছি তাই বলি। হে সখা তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, তুমি আদি, তুমি দিব্য, অজ ও বিভু। এই শত শত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমারই রচনা। আবার তুমিই নিত্য চেতনা রূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে সকল ভূতে বিরাজ মান।

সুখ, দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ, জয়, পরাজয়, জন্ম, মৃত্যু এ সকলই তোমার থেকেই সৃষ্ট হয়। তুমিই আদি, তুমিই মধ্য, তুমিই অনন্ত। তোমার বিভূতির দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ আচ্ছন্ন। তবে এ সকল কিছুর পরেও তুমি আমার সখা!”

সব্যসাচীর কণ্ঠ কম্পিত হচ্ছে যেন, “বারে বারে জন্মের পর জন্মে শত রূপে এসে তুমিই আমাকে পথ দেখিয়েছ। কেবল অবিদ্যা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমি তোমায় চিনতে পারিনি। সকল কিছুর স্রষ্টা তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ভগবান হলেও প্রতিটি জীবাত্মার অন্তরে তুমি চিরকাল পরম সখা হয়ে অবস্থান করছ। তোমায় জানার কোনো শেষ নেই, কোনো শুরু নেই। শুধু জানি এই ভব সাগরে তুমিই আমার মাঝি,তুমিই আমার চির সখা, তুমিই আমার গুরু বন্ধু!”

সব্যসাচীর কি যে হয়েছে হাউ হাউ করে কাঁদছে ও। ওর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে কার প্রতি অব্যক্ত এক টানে। কাঁদতে কাঁদতেই ও বলে, “হে সখা, তোমার পায়ে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম। যদি আমার উত্তরে তুষ্ট হয়ে থাক তাহলে তুমিই নিজেই আমায় বলো তুমি কে?”

এইবার আচমকাই মাথায় একটা হাতের স্পর্শ পায় সব্যসাচী। পরক্ষণেই সেই বাচ্চা ছেলেটির কণ্ঠ স্বর, “তথাস্তু।”

সব্যসাচী এইবার মুখ তুলে তাকায়। এইবার বাচ্চা ছেলেটির মুখ যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ও। অদ্ভুত দিব্য কান্তি মুখ। অদ্ভুত মায়াময় হাসি। ছেলেটির মুখের মধ্যে এমন গভীর তন্ময়াতার ভাব যা দেখলে হৃদয় শান্ত হয়ে আসে। ছেলেটি এক হাতে বাঁশি নিয়ে হাসতে হাসতেই বলে,

“আমি কে জানতে চাও? চারপাশে চেয়ে দেখো, আমায় সর্বত্র খুঁজে পাবে।"

ছেলেটি এইবার হাত দিয়ে চারিদিকে দেখায়। সব্যসাচী তাকে অনুসরণ করে। বাচ্চা ছেলেটি এইবার সেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকে,

“এই যে বাতাসে হাওয়া বইছে, এও আমি। এই নদীতে জল বইছে দেখছ এও আমি। এই আকাশে সূর্য দেখছ এও আমার তেজের থেকেই তৈরী। এই যে দিগন্ত বিস্তৃত বনানী দেখছ এও আমিই।

আমিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জড় ও চেতন জগতের সমস্ত কিছুর উৎস। দেব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, আদিত্য, বসু, মহর্ষি, রুদ্র, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবর্ষি থেকে শুরু

করে নাগ, সর্প, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, অশ্ব, হস্তী, শব্দ, বাক্য, অস্ত্র, গাভী সকলই আমার সৃষ্ট। এদের সকলের মধ্যে আমি পরম শ্রেষ্ঠ চেতনা রূপে সদা বর্তমান।

আমিই মৃত্যু, আমিই মহাকাল, আমিই কীর্তি, শ্রী, বাণী, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। হে সখা,আমিই সর্বভূতের বীজ স্বরূপ। আমাকে ছাড়া কোনোকিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়।"

ছেলেটি এইবার আবারও রহস্যময় হাসি হাসে। তারপর বলে, "তবে তুমিই ঠিকই বলেছ, যারা আমায় ভালোবেসে ভক্তি ভরে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আমি সদা তার হৃদয়ে তার বন্ধু রূপে বিরাজ করি।"

ছেলেটি আবার থামে। তারপরই রহস্য মাখা হাসি হেসে বলে, "হে জীবাত্মা, তোমার সবকটি উত্তরে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আমি কে আশা করি তা কিছুটা হয়তো এতক্ষণে তুমি উপলব্ধি করেছ। খুব কম জীবাত্মাই এতদূর এসে পৌঁছতে পারে। আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে। তুমি আসতে পেরেছ তার মানে তুমি যোগ্য।"

বাচ্চা ছেলেটি এইবার সব্যসাচীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর হাসি মাখা মুখেই বলে, "তুমি বিশুদ্ধ প্রেমময় চিত্তে জানতে চেয়েছ আমি কে। তোমায় আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি। দেখো আমি কে। কী আমার প্রকৃত স্বরূপ।"

সব্যসাচী এইবার খেয়াল করে চারিদিকের আবহাওয়া ক্রমশই যেন বদলে যাচ্ছে। ঝড় উঠছে। দিক দিগন্তব্যাপী প্রলয় শুরু হচ্ছে যেন।

একাদশ অধ্যায়

॥ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ॥

প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যেই কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে। সমস্ত সৃষ্টিকে সংহারকারী মহা প্রলয় শুরু হয়েছে যেন। আর সেই প্রলয়ের মধ্যেই নিজের মনে বাঁশি বাজাচ্ছে এক অপার্থিব বালক। তার বাঁশির সুর যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কণায় কণায়।

"দেখো আমি কে!" বাচ্চা ছেলেটার বলা কথাটা যেন মাথায় ঘুরছে সব্যসাচীর। আর তারই সঙ্গে ওর সারা শরীর শিউরে উঠছে সামনের দিকে তাকিয়ে। ও যা দেখছে তা কি সত্যি!

বাচ্চা ছেলেটির পেছনে ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এক বিশালকায় মূর্তি। উহু, এমন অদ্ভুত দর্শন জীব সে আগে কখনও দেখেনি। সেই বিশাল বিরাট জীবের শত শত মুখ, শত শত হাত, শত শত পা। তার একেকটা মুখ একেকটি জীবের। কোনো মুখে ধারালো দাঁত, কোনো মুখে ভয়াল জিহ্বা। কোথাও তীক্ষ্ণ নখর, কোথাও রুদ্র দৃষ্টি।

এ কে? এ কী? এ কি ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করছে সব্যসাচী? এই ভয়াল বিকট মূর্তির ভিতর শয়ে শয়ে মনুষ্য প্রবেশ করছে আর মুহূর্তে ভস্ম হচ্ছে। শয়ে শয়ে জীব জন্ম নিচ্ছে আবার লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। কোথাও অগ্নি, কোথাও বারি, কোথাও পর্বত, কোথাও সমুদ্র সমস্ত চরাচর যেন সমাহিত হয়েছে এই বিশাল বিকট মূর্তির ভিতরে। এ যেন সাক্ষাৎ সেই অনন্ত সনাতন চেতনা যিনি এই জগতের মধ্যে এবং এই জগৎ যার মধ্যে সদা বিরাজমান।

কিন্তু এই ভয়াল বিরাট রূপ দেখে সব্যসাচীর যারপরনাই ভয় লাগছে। সারা শরীরে কামড় বসাচ্ছে ভয়াবহ অস্বস্তি। এমন কোনো কিছু ওর চিন্তার অতীত। আর যা কিছু মনুষ্য চিন্তার অতীত তার সম্মুখীন যদি মানুষ হয় তাহলেই তো সৃষ্টি হয় ভয়ের। সব্যসাচী ভয় পাচ্ছে। প্রচন্ড আতঙ্কে এই বার ও চোখ বন্ধ করে ফেলে।

তারপর দুই হাত জোড় করে বলে, "আমায় ক্ষমা করো সখা। তোমার এই বিরাট বিশ্বরূপ সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমায় তুমি ক্ষমা করো। তুমি

আমার ভগবান রূপে, আমার সখা রূপে যেমন ছিল তেমন ভাবেই আমার সামনে এসো। তুমি কে তা আমি ভালোবাসা ও ভক্তির মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছি।”

সব্যসাচী খেয়াল করে এইবার যেন আচমকাই চারিদিকের ঝড় ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে। আবারও প্রকৃতি ধারণ করছে পরম সুন্দর রূপ। বাঁশির সুর ক্রমশ হয়ে উঠছে মোলায়েম, হৃদয় স্পর্শী।

ধীরে ধীরে ঝড় একসময় থেমে যায়। বাচ্চা ছেলেটি এইবার এগিয়ে আসে সব্যসাচীর কাছে। প্রসন্ন হাসি মাখা মুখেই সে বলে, “হে জীবাত্মা, কর্ম যজ্ঞের তিনটি পর্যায় তুমি সফল ভাবে অতিক্রম করেছ। এবার বলো তুমি কী চাও। কেমন জন্ম নিতে চাও তুমি ? তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হবে। তুমি যেমনভাবে জন্মাতে চাও সেভাবেই জন্ম নেবে।”

“আমি যে আর জন্মাতে চাই না।” কথাগুলো বলতে বলতে সব্যসাচীর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। কোনোমতেই ও বলে, “আমি তোমার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আর জীবন ও মৃত্যুর চক্রে আমি আবর্তিত হয়ে চাই না। আমি তোমার পায়েই আশ্রয় পেতে চাই। তোমার পরম ধামে আমায় জায়গা দাও!”

বাচ্চা ছেলেটি হাসে। পরম মমতায় সব্যসাচীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, “তা কী করে দেব? তুমি যে জীবন থেকে পালিয়ে এসেছ। যারা জীবন থেকে পালিয়ে যায়, জীবনের সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা যে আমায় পায় না। কর্মযজ্ঞের নিয়মানুসারে তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করেছ। সবকটি পর্যায় সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছ। তাই তুমি নিজ পছন্দ অনুসারে পরের জন্মের অধিকারী। আমি শুধু সেটুকুই তোমায় দিতে পারি।”

“আর তোমাকে পেতে গেলে কী করতে হবে?”

“বাঁচতে হবে সখা, বাঁচতে হবে। তোমার চিন্তা বিসর্জন দিয়ে, তোমার সমস্ত কর্ম আমায় উৎসর্গ করে প্রাণ খুলে বাঁচতে হবে। আর প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখতে হবে যে আমি আছি। আমায় তুমি কর্মের মধ্যেই পাবে। অন্যত্র নয়। তাই মনুষ্য জীবনে যে সকল জীবাত্মারা আমার প্রতি অবিচল ভক্তি রেখে, কোনো কিছুর আশা না করেই নিজ কর্ম পালন করে তারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর যারা

জীবন থেকে পালিয়ে যায়, জীবন সংগ্রাম থেকে বিমুখ হয়ে থাকে তারা কোনো দিন আমায় পায় না। তারা কেবল আমার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।”

সব্যসাচী বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে থাকে বাচ্চাটির মুখের দিকে। তারপর আচমকাই বলে, “যে জীবন থেকে আমি পালিয়ে এসেছি সেই জীবনটা আমি আরেকবার বাঁচতে পারি?”

বাচ্চা ছেলেটি হাসে। সব্যসাচীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, “পারো। তবে আবার কেন ওই জীবনে ফিরবে তুমি? চাইলেই তো তুমি নতুন জীবন পেতে পারো...”

“না আমি ওই জীবনেই ফিরতে চাই। আমি চাই না জীবন থেকে, জীবনের সংগ্রাম থেকে পালিয়ে তোমার থেকে দূরে সরে যেতে। তাই আমার নতুন জীবন চাই না। আসলে জীবন মানেই তো সংগ্রাম। যে জীবন আমি ভাবছি আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে তাতেও কোনো না কোনো সংগ্রাম তো থাকবেই। আজ এখান থেকে পালালে কাল ওখান থেকেও পালাব। জন্মের পর জন্ম এভাবেই তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার যে আর কোনদিনই তোমায় পাওয়া হবে না।”

সব্যসাচী কাতর কণ্ঠে এইবার বাচ্চা ছেলেটির পা জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে, “তাই সখা, দয়া করে আমাকে আমার আগের জীবনেই ফিরিয়ে দাও। আরেকবার সুযোগ দাও জীবনটাকে বাঁচার। আর তারই সঙ্গে দয়া করে আমার মন থেকে তোমার এই স্মৃতিগুলো মুছে দিও না। তোমার এই দিব্য জ্ঞান নিয়ে আমায় জীবনে ফিরতে দাও। এটুকুই শুধু তোমার কাছে আমার চাওয়া।”

বাচ্চা ছেলেটি আবারও হাসে। তারপর মায়াময় ভাবে সব্যসাচীর মাথায় হাত রেখে বলে, “তথাস্তু।”

উপসংহার

॥ ভক্তি যোগ ॥

"আপনি ঠিক আছে? একটু বেটার লাগছে এখন আপনার?"

বিছানার উপরেই উঠে বসে সব্যসাচী। চারপাশটা তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় ও। ওর পাশ দিয়ে অনেকগুলো বেড পরপর সাজানো। প্রতিটা বেডে সাদা পোশাক পরা কেউ না কেউ শুয়ে আছে। ও কোথায় এখন?

"ধীরে ধীরে। তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি ঠিক আছেন এখন?"

পুনরায় সেই মহিলা কণ্ঠে ঘোর ভাঙে সব্যসাচীর। সামনে চেয়ে দেখে একজন নার্স। ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। নার্সের মুখে তৃপ্তির হাসি।

"আপনি যে জ্ঞান ফিরে পাবেন ভাবতেই পারিনি। মিরাকল। ডাক্তার বাবুও বলে দিয়েছিলেন আশা নেই। আস্তে আস্তে আপনার জীবনের বাতি নিভে যাচ্ছে।"

"কী হয়েছিল আমার?" অবাক হয়েই সব্যসাচী প্রশ্ন করে।

"অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। বাঁচার আশা ছিল না। প্রায় আড়াই সপ্তাহ আপনি কোমায় ছিলেন। কিন্তু ভগবানের লীলা দেখুন। কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে!"

কথাটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সব্যসাচীর। নিজের হাতে নিজের শরীর স্পর্শ করে দেখে ও। সত্যিই ও আবার ওর জীবনে ফিরে এসেছে। তার মানে ঈশ্বরের কাছে ও যা পেয়েছে তা ও পেয়েছে শেষমেশ?

"আমায় কে এখানে ভর্তি করাল?"

"মোহন নামের কেউ একজন। তার নাকি ওষুধের দোকান। সেখানে আপনি কাজ করতেন। অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ আচমকা দোকানে নেই দেখে ওনার সন্দেহ হয়েছিল। ঠিক সময়ে গেছিলেন ভাগ্যিস নাহলে তো আপনাকে আর বাঁচানো যেত না।"

সব্যসাচী এইবার কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এখনও ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। ও না অনুভব করল তা কি সত্যি ছিল? নাকি শুধুই একটা স্বপ্ন!

"বিশ্বাস করলে সবই সত্যিই। বিশ্বাস, বিশ্বাসটাই আসল। ওটা না থাকলে কিছুই হওয়ার নয়।" পাশের বেড থেকে এক বৃদ্ধের কথা ভেসে আসে।

নার্সটি ওকে চেক করতে করতেই বলে, "ভেরি স্যাড কেস, আপনার সঙ্গেই পাশের বেডের মেয়েটি এসেছিল। একইরকম সুইসাইড কেস। কাল রাতে ও এক্সপায়ার করে গেল। আর দেখুন আজ সকালে আপনি আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। ভগবানের কি আশ্চর্য লীলা তাই না! ওর বাবার জন্য খারাপ লাগছে। এই ক'দিন রোজ মেয়ের পাশে বসে গীতা পাঠ করে শোনাত।"

সব্যসাচী এইবার পাশের বেডের দিকে তাকিয়ে দেখে। বেডটা খালি। এক বয়স্ক লোক শূন্য চোখে সেখানে বসে আছে। তার পাশে মধ্য বয়সী মহিলা। তার দুই চোখে জল।

"আপনাকে দেখে তো সুস্থই মনে হচ্ছে। আচমকা এতটা রিকভারি কাউকে করতে দেখিনি। এখনই বেশি হাঁটা চলার প্রয়োজন নেই। ডক্টর এসে চেক করবেন তারপর সব হবে। আমি আসছি এখন।"

নার্সটি চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে হতে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করল, "এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা জানতে পারি?"

মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমার নাম বিষ্ণু প্রিয়া।"

****

"মা আমাদের ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি!"

মহিলাটি বিছানার উপর আছড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। ওনার পাশে রাখা মোবাইল থেকে উঁকি মারছে ওর মেয়ের ছবি। সেই সুন্দর মুখ, ছোট করে কাটা চুল, সেই মায়াময় চোখ।

"আপনাদের মেয়ের নাম যোগমায়া?"

সব্যসাচীর প্রশ্নে মহিলা এবং বৃদ্ধ দুজনেই চমকে ওঠে যেন। মহিলাটিই জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়েকে চিনতে?"

"হ্যাঁ।" সব্যসাচী মাথা নাড়ায়।

“কিভাবে চিনতে ওকে? তোমার কথা কখনও ও বলেনি তো। তুমি ওর বন্ধু?”

সব্যসাচী এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। নীরব থাকে। কী বলবে ও। ওর কাছে কোনো উত্তর নেই।

“চুপ করে গেলে যে? ও নিশ্চয়ই তোমাকেও ওর আগের জন্মের গল্প শুনিয়েছিল? ও নিশ্চয়ই তোমাকেও বলেছে ও সাধারণ মানুষ নয়। আগের অনেক জন্মে ও যোগ সাধনা করেছে। এ জন্মেও করতে চায়...”

মহিলাটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে, “আমরা ওকে ছাড়লাম না বলে ও চলে গেল। ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল। শুধু বলত জানো বাবা, ও ওর জীবনের আসল উদ্দেশ্যটা জানে। ও আমাদের মত জীবনটাকে নষ্ট করতে চায় না। ও তাকে জানতে চায়...”

মহিলাটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বৃদ্ধ তার আগেই ইশারায় ওনাকে থামিয়ে দিল। তারপর মৃদু হেসে বলল, “আমার নাতনি, বুঝলে তো আর পাঁচটা মানুষের মত ছিল না। ছোটবেলা থেকে আমার কাছে মানুষ তো। হয়ত ওকে আমি মানুষ করতে পারিনি ঠিক করে...”

“আপনার নাতনি খুব ভালো একজন মানুষ ছিল।” সব্যসাচীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, “ওর মত মানুষের দেখা পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। চিন্তা করবেন ও যেখানে গেছে সেখানে ভালোই আছে নিশ্চয়ই।”

“তুমি জানো বাবা, ও কোথায় গেছে?”

সব্যসাচী নীরব থাকে। ওর মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর নগরী থেকে বেরোবার পর ওর জন্য ঘোষনা হলেও ওই মেয়েটার জন্য কোনো ঘোষনা হয়নি। হয়তো তখনই ওর নরক ভোগ শেষ হয়েছিল।

ঠিক যেমন সব্যসাচীকেও বৈতরনীর পর আরও দুটো নরক ভোগ করতে হয়নি। তার আগেই ও চলে গেছিল তৃতীয় পর্যায়ে। কিন্তু শেষমেশ কী হয়েছিল ওর সঙ্গে কে জানে!

সব্যসাচী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই এবার বলে, “যার এত গভীর আত্মজ্ঞান সে খারাপ কোথাও যেতেই পারে না। নিশ্চিন্ত থাকুন স্বয়ং ঈশ্বর আপনার নাতনির সহায় আছেন। ও যেখানেই আছে ভালো আছে আমার বিশ্বাস।”

বয়স্ক ভদ্রলোক সব্যসাচীর কথা শুনে মৃদু হাসে। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করে, “তা তোমার সঙ্গে ওর আলাপ কোথায় হয়েছিল বাবা?”

সব্যসাচী হাসে। মুখে কোনো উত্তর দেয় না। শুধু মনে মনে বলে, “নরকে!”

****

মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সব্যসাচী। এরমধ্যে দেখতে দেখতে কেটে গেছে আরও একটা সপ্তাহ। ও এখন যাকে বকে একেবারে সুস্থ।

ওর সামনে একটা বড় চৌরাস্তার মোড়। শয়ে শয়ে লোক সেই রাস্তা পার করছে এই মুহূর্তে। ওর গন্তব্য এই রাস্তা। পেরিয়ে আরও মিনিট দশেকের পথ। তারপরেই একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে বড় একটা বিল্ডিং। সেখানেই আজ তেত্রিশতম ইন্টারভিউ সব্যসাচীর।

বুকের ভিতর প্রাণ ভরে শ্বাস নেয় সব্যসাচী। হ্যাঁ, ও হেরে যায়নি। সাময়িক ভাবে জীবন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেও শেষ মেষ ও আবার ফিরে এসেছে এই জীবন যুদ্ধের ময়দানেই। এই যে ওর সামনে শয়ে শয়ে মানুষ রাস্তা পারাপার করছে এদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সংগ্রাম করছে জীবনে।

জীবন মানেই তো সংগ্রাম। বেঁচে থাকতে গেলে এই সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, সাফল্য ব্যর্থতা সবকিছুই আসবে। কিন্তু এর কোনকিছুতেই থেমে গেলে চলবে না। বেঁচে থাকতে গেলে তার প্রতি ভরসা অটুট রেখে নিজের কর্ম করে যেতে হবে।

জীবনটা তো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থেকে নষ্ট করার না। মনুষ্য জন্ম তাকে জানার জন্য, তাকে চেনার জন্য। তাই জীবন নিয়ে আর ‘নয়-ছয়’ নয়। জীবনের এবার যাই আসুক না কেন তাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। সাক্ষাৎ নরক দর্শন করে এই অনুভূতিই হয়েছে সব্যসাচীর।

আজ থেকে এক মাস আগের সব্যসাচী আর এখনের সব্যসাচীর মধ্যে তাই আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখনকার সব্যসাচী জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে না, সাফল্য ব্যর্থতা, সুখ দুঃখ কোনো কিছু নিয়েই বিচলিত হয় না।

তার প্রেম, তার ভক্তি সমস্ত কিছুই সেই পরম সত্তার পায়ে নিবেদিত। তাই তিনি যা দেবেন তাকেই পরম তৃপ্তিতে সে গ্রহণ করবে এই তার জীবনের লক্ষ্য।

বুক ভরে আবারও শ্বাস নেয় সব্যসাচী। রাস্তার ওইদিকে একটা বাচ্চা ছেলে অনেক ক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার হাতে ধরা অনেকগুলো বাঁশি। ওর কপালে চন্দনের তিলক, মুখে একটা সুন্দর হাসি। সব্যসাচী এইবার রাস্তা পার করে ওর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর কিছু না ভেবেই ওর থেকে একটা বাঁশি কেনে।

সব্যসাচীর থেকে টাকা নিয়ে ওর দিকে বাঁশিটা এগিয়ে দে বাচ্চাটি। তারপর হেসে বলে, "হরে কৃষ্ণ! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।"

সব্যসাচী একবার বাঁশিটাকে দেখে একবার বাচ্চাটিকে। তারপর মৃদু হেসেই উত্তর দেয়,

"হরে কৃষ্ণ, ঈশ্বর সকলের মঙ্গলই করেন।"

(সমাপ্ত)